বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুন - জুলাই ২০১৩ মূল্য ₹১০/
Vol.2, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2013, Price ₹10/- only

প্রভুবার্তা

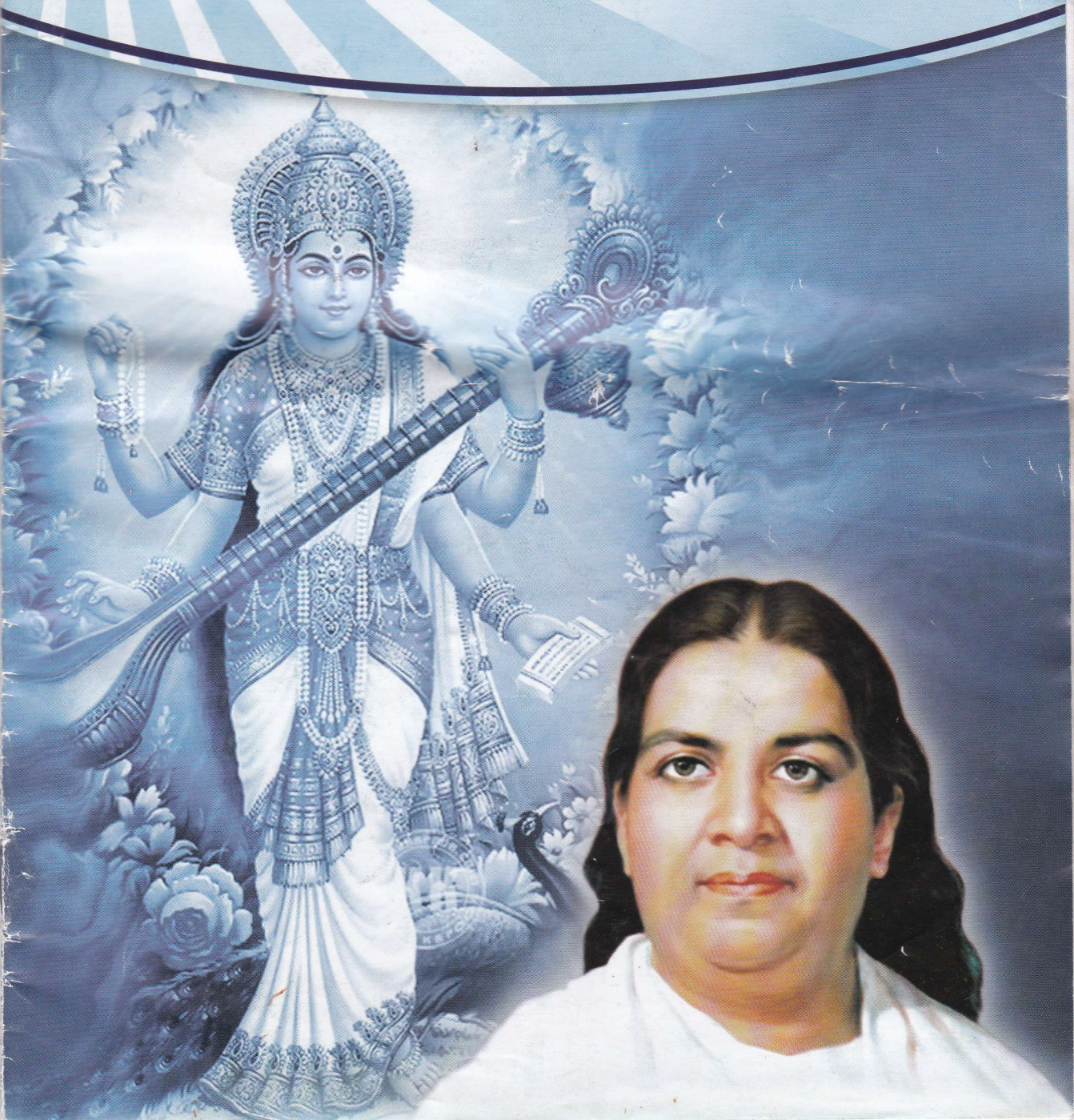

Vol.2, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2013

মিরিক ঃ
ভ্রাতা ইউসুন মাসুনাগা,
আন্তর্জাতিক ইউরেশিয়া রেইকি
প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সহধর্মিনীকে
ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করছেন
বি. কে. পূর্ণিমা।

শিলিগুড়ি ঃ
শুকনা স্টেশনের কাছে টয়ট্রেনে
ব্রহ্মাকুমার ভাইবোনেদের অভিনন্দন
জানাচ্ছে স্থানীয় লোকেরা।

হলদিয়া ঃ
চিত্র-পরিচালক ভ্রাতা রাজীবকে ঈশ্বরীয়
উপহার দিচ্ছেন ব্রহ্মাকুমারী ভারতী।

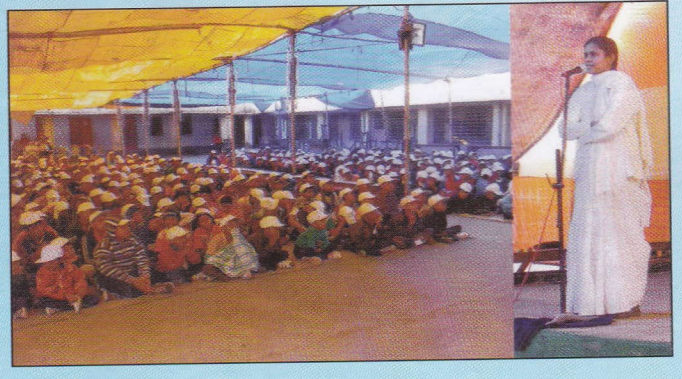

শামুকপোতা ঃ
বঙ্গীয় শিশুবিকাশ সংগঠনে ভাষণ দিচ্ছেন
বি. কে. অঞ্জনা।

সম্পাদকীয়

সুজলা-সুফলা এ ভারত ভূমি - যেন স্নেহের আঁচল ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেহে। শস্য-শ্যামলিমা সবুজ প্রান্তর, নদী-বিধৌত গিরি তরুবর। তাদের পরশে হরষ জাগায়েছে হৃদয়ে সবার। যেন মমতাময়ী মা তাঁর স্নেহের পরশে সন্তানেরে করিছে লালন। তাই তো ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলা হয়।

প্রকৃতির অনন্যদানে ধনী মানব হৃদয় মায়ের এই দান হৃদয়ে জাগরুক রেখে যুগ যুগ ধরে তাকে হৃদয়ে করেছে পালন। মাতৃশক্তি পরম সমাদরে হয়েছে পূজিতা। মাতৃশক্তির অবমূল্যায়ন বিশ্বকে আজ করে তুলেছে অনাথ, অশান্ত, দিশাহীন; তাই সময় হয়েছে ফিরে দেখার।

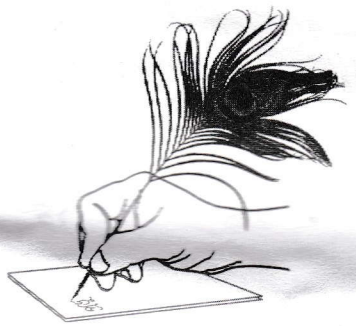

এই ফিরে দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে যিনি এই জগতে এসেছিলেন তিনি পিতাশ্রী প্রজাপিতা ব্রহ্মা। নারীকে তাঁর নীচতা, হীনমন্যতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে যে মর্যাদার আসন তিনি দিয়েছিলেন তার প্রথম প্রতিভূ জগদম্বা, জগতমাতা, মাতেশ্বরী সরস্বতী। ঈশ্বর নির্দেশিত পথে বিশ্ব উদ্ধারে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যুগ যুগ ধরে তা ব্রহ্মার মানস কন্যা সরস্বতী রূপে পূজিতা হয়ে আসছে। জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে তার সুফল দেওয়ায় তিনি অতুলনীয়া। ছোট্ট এক কুমারী কন্যা থেকে যজ্ঞমাতায় উত্তরণ ইতিহাসের অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণ।

ভারতভূমি আজ শঙ্কিত, তাঁর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। সবাই ত্রস্ত, বিভ্রান্ত, পথহারা। প্রতিদিনের সংবাদপত্র যে সকল বিভীষিকাময় সংবাদ বয়ে আনছে, তাতে সবাই শঙ্কিত, মূক, বিমূঢ়। রাজদণ্ড বাহক থেকে সমাজসংস্কার, ধর্মধ্বজাধারী - কেউ জানে না পথ কী? নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন, কঠোর প্রয়োগের অনুশাসন কিছুতেই অভীষ্ট ফল লাভ হচ্ছে না।

তাই পিতাশ্রী প্রজাপিতার নির্দেশিত পথ এবং মাম্মা সরস্বতীর অনুসৃত পথে আসবে মুক্তি। সে যে শুধুমাত্র পরমুখাপেক্ষী, ভোগ্যসামগ্রী নয়; বিশ্বসংসারে তাঁর অবদান কত অসীম তা অনুধাবনে তার মধ্যে যে দেবীশক্তি জাগরিত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাম্মা জগদম্বা সরস্বতী। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় মিথ্যা নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন আজ সময় এসেছে তার প্রকৃত মূল্যায়নের ও প্রসারণের। তবেই আসবে প্রকৃত মুক্তি, নারীমুক্তি নিজ আসনে হবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিতা।

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচী

১।	সম্পাদকীয়	১
২।	সঞ্জীবনী বুটি	২
৩।	কুম্ভকর্ণের প্রকৃত পরিচয়	৩
৪।	মাতৃঋণ	৫
৫।	মাম্মা সর্বদৈবীগুণ সম্পন্না ছিলেন	৬
৬।	সন্তুষ্টতাই সম্পন্নতা	৯
৭।	পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ ও ব্রহ্মার জ্ঞান	১০
৮।	নতুন জন্ম (কবিতা)	১৩
৯।	আদিদেব	১৪
১০।	দুনিয়ার বিনাশ নয় কলিযুগী কালচারের বিনাশ	১৬
১১।	কর্ম, সংস্কার সম্বন্ধ ও পুনর্জন্ম	১৭
১২।	স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ	১৯
১৩।	নাগারা আর নজারে	২০
১৪।	ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা নয় বাস্তব	২১
১৫।	ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়	২৩
১৬।	প্রণব প্রণিধি (কবিতা)	২৪

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসৃত

Important Information :
All Email communications for this Bengali Magazine (Prabhubarta) must be sent to **bm@bkprabhubarta.org** only
Phone : 033-2475 3521
033-2474 5251
Annual Subscription : ₹60/-

প্রচ্ছদ পরিচিতি

জ্ঞানবাদিনী ব্রহ্মানন্দিনী মানবের মুক্তিদান তরে
ঈশ্বর স্বয়ং মাম্মারূপে পাঠায়েছে তাঁর এই সংসারে ।

সঞ্জীবনী বুটি

মহাবীর মাত্রই 'লাইট' ও 'মাইট' হাউস। জ্ঞান লাইট আর যোগ মাইট। এই দুই শক্তিতে বলীয়ান আত্মা প্রতিটি পরিস্থিতি সেকেন্ডে পাস করেন। তিনিই হন 'পাস উইদ্ অনার'। চূড়ান্ত সময়ে পাস উইদ্ অনার হলে ধর্মরাজ তাঁকে অনার দেন।

কুম্ভকর্ণের প্রকৃত পরিচয়

সঞ্জয়ের কলম থেকে....

রামায়ণে কুম্ভকর্ণের যে পরিচয় আমরা পাই তা বেশ বিচিত্র। কুম্ভকর্ণ লঙ্কাধিপতি রাবণের এক ভাই যে ছ'মাস ঘুমিয়ে থাকে, একদিনের জন্য জাগে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাস্তবে কুম্ভকর্ণ কোন জীবন্ত চরিত্র নয় এক প্রতীকী মাত্র। যে মানুষের 'কর্ণ' (কান) 'কুম্ভ' (কলস)-এর সমান তাকে কুম্ভকর্ণ বলা হয়। কুম্ভের বিশেষতা হল যতই আওয়াজ করোনা কেন, যে কে সেই থেকে যায়। কোন হেলদোল হয় না। ধরা যাক্, বলা হল ঃ 'জাগো, জাগো হে আত্মা, ভগবান পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, তাঁর সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখশান্তির অধিকারী হও'। এই কথাগুলি আওয়াজ করে কলসিকে বললে তার ভেতরে প্রতিধ্বনি হবে কিন্তু তার জেগে ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। ঠিক এরূপ কিছু মানুষ আছেন যাদের মঙ্গলের কথা, জ্ঞানের কথা, চিত্তাকর্ষক রহস্যের কথা যতই শোনানো হোক না কেন, তারা জড়বৎ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিছুই তাদের হয় না। এরাই প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকর্ণ।

কুম্ভকর্ণ নির্জীব, বুদ্ধিহীন, আলস্যপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয়

যদি কোন মানুষের বুদ্ধিতে সাধারণ বিষয়ও না ধরে তাহলে বলা হয় 'গোবরভরা মাথা'। আবার কোন কথা শোনালে বা বললে যদি তার কোন প্রতিক্রিয়া না হয়, তাহলে বলা হয়, এ তো জড়বস্তু। আবার কোন কথা শুনে বা বুঝে নিজের জীবনে যদি কেউ ধারণ করে তাহলে বলা হয় এতো বেশ বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, সমুদ্রের মতো গভীরতা আছে। বুদ্ধির শিথিলতাকে 'গোবর', প্রতিক্রিয়াহীনতাকে 'জড়', বুঝদারকে 'সমুদ্রের তলের' সাথে তুলনা করা হয়। মানুষের প্রসঙ্গ আনলে আমরা দেখব মানুষ মাত্রই তো 'কালা' নয় কিন্তু তারা ভাবটা এমন দেখান মনে হয় যেন তার কিছুই শোনেনি। এদের কানকেই 'কুম্ভের' সাথে উপমা টানা হয়েছে। মাটির তো কোন কান হয় না তাই তাকে শোনালে তার কোন প্রত্যুত্তরই পাওয়া যায় না। এরূপ বহু মানুষকে কুম্ভকর্ণ বলা হয়। এদের যতই ভালো কথা, স্ব-উন্নতির কথা, বাস্তব সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের কথা, পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করার যুক্তি যতই বলা হোকনা কেন নিজের অবস্থানে অনড় থাকে। এরাই প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকর্ণ যারা নির্জীব, বুদ্ধিহীন, আলস্যপ্রিয়, নিদ্রাপ্রিয় হয়ে জীবন কাটায়।

দেহ-অভিমানের পুত্র কুম্ভকর্ণ

দারুণ পরিশ্রম করে যদিও জাগানো গেল কুম্ভকর্ণকে কিন্তু 'রাম'কে তার পছন্দ হলো না, বরং বিরোধিতা শুরু করল। রামের মিলন সুখে ডুব না দিয়ে সে মদের নেশায় চুর হয়ে আরো তমোগুণী হতে লাগল। তার এই জাগরণকে কেমন জাগরণ বলা হবে? এসব মানুষকে কুম্ভকর্ণই বলা হবে। এরাই আসলে 'অসুর' বা 'রাক্ষস'। রামের (শিববাবা) পক্ষ অবলম্বন না করে তাঁর বিপক্ষে যাওয়া উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে রাবণের পক্ষ হয়ে লড়াই করা - এই ধরনের মানুষ সত্যসত্যই ঈশ্বরবিমুখ কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণকে রাবণের ভাই বলা হয়। 'রাবণ' শব্দের অর্থ যে অন্যকে কাঁদায়। রাবণের দশমাথার অন্তর্নিহিত অর্থ হল পাঁচ বিকার পুরুষের আর পাঁচ বিকার নারীর। পাঁচ বিকারের পিতা হল 'দেহ-অভিমান'। অবহেলা, নিদ্রা ও আলস্যের পিতাও হল এই দেহ-অভিমান।

দেহ-অভিমান রূপী পিতার সন্তান হওয়ার জন্য কুম্ভকর্ণকে রাবণের ভাই বলা হয়।

'ইন্দ্রপদ'-এর পরিবর্তে নিদ্রাপদ

যে মানুষ ব্রহ্মার থেকে 'ইন্দ্রপদ' অর্থাৎ দেবতার ও রাজার পদ না নিয়ে নিদ্রাপদ নেয় তাদের কুম্ভকর্ণ বলা হবে। ব্রহ্মাকে তো সর্বজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং তাঁর জ্ঞানকে সর্বোত্তম বলা হয়। তিনি তো জগৎপিতা। তাই প্রজাপিতার কাছ থেকে জ্ঞানরূপী বরদান লাভ করে মানুষ সবকিছু প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু এসব প্রাপ্তি বাদ দিয়ে যদি কেই নিদ্রাকে পেতে চায় তাহলে তো তাকে অসুরই বলা হবে।

সুগ্রীব কে?

কাহিনিতে দেখানো হয়েছে কুম্ভকর্ণ 'সুগ্রীব'কে বন্দি করেছিল। এর আসল অর্থ কী? 'গ্রীব' কথার অর্থ কণ্ঠ বা গলা। যাঁর গলা সুন্দর অর্থাৎ যাঁর বাণী সুমধুর, প্রিয়, সুকোমল ও হিতকর তাঁকে 'সুগ্রীব' বলা হয়। যিনি রামের (শিববাবা) পক্ষে কথা বলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী, যিনি নিজকণ্ঠে প্রভুর মহিমা করেন, প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যক্তির গলাকেই সুন্দর বলা হয়। এরূপ নর বাস্তবে রামের সেবকদের (বানরদের) সেনাপতি। কারণ এঁরা ঈশ্বরের পরিচয় দেয়, ঈশ্বরের সহযোগী হন এবং নিজের বাক্যবল ও প্রভুপ্রীতির সাহায্যে আসুরিক বলের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কখনো এরূপ গুণীমানুষও কুম্ভকর্ণের দ্বারা বন্দি হয়ে যায়। অর্থাৎ অবহেলা, আলস্য ও নিদ্রার সোনার জালে আটকা পড়েন, সুমধুর কল্যাণকারী বাণী তাঁর স্তব্ধ হয়ে যায়। অতএব রাবণকেই জ্বালালে শুধু হবে না তার সাথে সাথে অবশ্যই কুম্ভকর্ণকেও জ্বালাতে হবে।

দেবতার ও রাজার পদ না নিয়ে নিদ্রাপদ নেয় তাদের কুম্ভকর্ণ বলা হবে

নিজেকে দেখার সময় এখনো আছে

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই কুম্ভকর্ণ আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আলস্য, নিদ্রা, ঈশ্বরবিমুখতার কিছু না কিছু প্রভাব অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ তার মনের মধ্যে অবস্থান করে আছে। ব্রহ্মাকুমারীজ্ মানুষকে সন্দেশ দিচ্ছেন, 'জাগো, জাগো, পরমপিতা পরমাত্মা রাম (ভগবান শিববাবা) অবতারিত হয়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সুখশান্তির বরদান দিচ্ছেন।' তবুও মনুষ্যকুল জাগছেন না বরং তমোগুণী ভোগ নিয়ে মস্ত। শুধু তাই নয় কখনো কখনো অনেকে ঈশ্বরের সহযোগী সুগ্রীবদের ঘোরতর বিরুদ্ধাচারণ করে কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার কাজে উঠে পড়ে লাগেন। আবার এমনও মানুষ আছেন যারা জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি শুনে সাময়িক ভাবে জেগে ওঠেন আবার ছমাসের জন্য জ্ঞান-যোগ চর্চা না করে ঘুমিয়ে পড়েন। সুতরাং এ সমস্ত দিক দেখে বলা যায় কুম্ভকর্ণ এখনো ঘোরতর ভাবে বেঁচে আছে। ব্রহ্মাকুমারীজের ভাইবোনেরা ভগবানের অবতরণের বার্তা দেওয়ার সাথে সাথে স্পষ্ট ইশারা দিচ্ছেন যে বিশ্বব্যাপী ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হতে চলেছে। কিন্তু এসব শুনে লোকজন না শোনার ভান করে বলেন, 'এসব ব্যাপারে আমাদের কোন ইন্টারেস্ট নেই আর আমাদের হাতে সময়ও নেই, আমাদের অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকতে দিন'। শুধু এখানেই অন্ত.নয়, এরা ঘড়া ঘড়া কামরূপী বিষ পান করতে আন্তরিক আগ্রহী। অতএব এরা কি সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণ নয়? তবে সেই সাংঘাতিক সময় খুব বেশি দূরে নয়, বিনাশের দামামা বাজল বলে এবং এরাও অবশ্যই জাগবে, তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তখন

তদের মুখ থেকে বেরুবে - 'জ্ঞানসূর্য পরমাত্মা ভগবান আবির্ভূত হওয়াতেও আমি আলস্য অবহেলায় সময় কাটিয়েছি, আমি তাঁর থেকে ইন্দ্রপদের বরদান পেলাম না। হায়! আমাকে জাগানো হয়েছে কিন্তু আমি সময়মতো জাগিনি।'

এই মুহূর্তে সব পাঠককে দেখতে হবে নিজের মন ভবনের কোথাও কুম্ভকর্ণের আলস্য, অবহেলা, নিদ্রা, অজ্ঞানতা, অহংকার, ঈশ্বরবিমুখতা ইত্যাদি আত্মগোপন করে নেই তো? যদি আত্মগোপন করে থাকে তাহলে সেই রাবণের ভাইকে যোগাগ্নি দ্বারা ভস্ম করে ছাইয়ে পরিণত করতে হবে। কেননা নিজেকে দেখার সময় এখনো আছে।

মাতৃঋণ

লেখাপড়া শিখে একটি ছেলে বেশ বড় হয়েছে। অতি শৈশবে সে তার পিতাকে হারিয়েছে। পিতার অবর্তমানে যারপর নেই সবদিক থেকে প্রাণপণ লড়াই করে মা তাকে বিশেষ একজনে পরিণত করেছে। লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মেয়ের সাথে তাকে বিয়েও দিয়েছে। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর মায়ের কাছ থেকে অভিযোগ অনুযোগ আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ হল - তাদের স্টেটাসের সাথে শাশুড়ির স্টেটাস ফিট হচ্ছে না। কারণ তাদের স্তরের মানুষদের কাছে বলতে সংকোচ হচ্ছে মেয়ের শাশুড়ি লেখাপড়া না জানা অশিক্ষিতা এক পরিচারিকা। বিষয়টা নিয়ে বেশ ভালোরকম চর্চা হয়েছে। একদিন ছেলে মাকে বলছে, মা স্থির করে ফেলেছি যে কোন মূল্যে তোমার ঋণ শোধ করে তুমি আর আমি আলাদা হয়ে যাব। এতে তুমিও সুখী হবে আর আমিও সুখী হব। আজ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য যা যা খরচ করেছো তা হিসাব করে বলো, আমি সুদ সমেত সব তোমাকে ফেরত দিয়ে ঋণ মুক্ত হব। একথা শুনে মা তো বাক্‌রহিত। বলল, বাবা হিসাব তো বেশ লম্বা, আমাকে চিন্তা করে বলতে হবে। আমাকে কিছুটা সময় দে। ছেলেও বলল, মা তাড়াহুড়ো কিছু নয়, দু-চারদিনের মধ্যে বলো। রাত হয়েছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা একঘটি জল নিয়ে এসে ছেলের বিছানায় ঢেলে দিয়েছে। ছেলে কাত হয়ে পাশ ফিরে শুল। মা আবার আর এক ঘটি জল ঢেলে দিয়েছে। ছেলে আবার অন্যদিকে পাশ ফিরে শুল। মা এইভাবে জল ঢেলে চলেছে। ছেলে আর সহ্য করতে না পেরে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, মা এসব কী হচ্ছে? আমার বিছানা জল আর জল করে দিলে? এখন ঘুমোব কীভাবে? মা বলল, বাবা তুই আমাকে সারা জীবনের হিসাব করার কথা বলেছিলি না? তা আমি হিসাব করতে লেগেছি শিশুবেলায় তুই বিছানা ভিজিয়ে কত রাত আমাকে অনিদ্রায় রেখেছিস? এতো সবে প্রথম রাত, এতেই ঘাবড়ে গেলি বাবা? আমি তো হিসাব শুরুই করিনি যে কত তোর কাছে চাইব? মায়ের এই কথায় ছেলের হৃদয় কেঁপে উঠল। সারারাত সে আর চিন্তায় চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তার বিবেকের দৃষ্টি খুলে গেল। তার চেতনায় উপলব্ধি হল মায়ের ঋণ জীবনভর শোধ হয় না। মা হল শীতল ছায়া আর বাবা হল বটগাছ, যার নীচে সন্তান নিশ্চিন্তে জীবন কাটায়। মাতা তার সন্তানের জন্য প্রতিটি দুঃখ ধারণ করার জন্য তৈরি থাকে সেখানে পিতা সারাজীবন তা পানই করে চলে। অতএব মা-বাবার ঋণ কখনই শোধ করা যায় না। আমরা তো তাঁদের কৃতকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের সেবা করে নিজেরই কল্যাণ করি। কারণ আমরাও তো ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্মের কাছে একই জিনিস চাইব না।

সর্বদৈবীগুণ সম্পন্না মাম্মা

-দাদি জানকীজি

মাম্মাকে আমি প্রথম থেকেই জানতাম কিন্তু কুমারকা দাদির (দাদি প্রকাশমণি) মতো তাঁর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ ছিল না। ওঁরা দুজনেই বয়সে আমার থেকে ছোট ছিলেন। মাম্মা ভীষণ সক্রিয় ছিলেন, আমাদের থেকে অনেক ব্যতিক্রম। অন্যান্য বোনেদেরে থেকে তিনি অনেক বেশি উজ্জ্বল ও দৃষ্টি আকর্ষণীয় ছিলেন। ওম্ মণ্ডলীতে আসার পর তাঁর অতি দ্রুত পরিবর্তন সকলের দারুণ লেগেছিল। যখন আমি করাচীতে এলাম কেউ আমাকে বলল, তুমি মাম্মাকে দেখেছ? মাম্মার সাথে সাক্ষাৎ করেছ? আমি ভাবলাম বাবার যুগল যশোদা মাতার সম্বন্ধে বলছে। আমি বললাম, দেখা করে নেব কিন্তু ২-৩ দিন বাদে বুঝলাম মাম্মা কাকে বলছে।

মাম্মার তপস্যা প্রেরণাদায়ী

এক-দু বছরের মধ্যে মাম্মার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তা অতুলনীয়। মাম্মার চোখ, মাম্মার কথা, মাম্মার ব্যক্তিত্ব - এসব অলৌকিকতায় পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মাম্মা যখন জ্ঞান শোনাতেন তখন মনে হত শুধুমাত্র বাবার দেওয়া জ্ঞান বলছেন না তিনি নিজে সেই জ্ঞান আত্মীকরণ করে পরিবেশন করছেন। মাম্মার রুমের পাশে উঠোন ছিল। মাম্মাকে দেখতাম হয় উঠোনে বা ছাদে তিনি চেয়ারে যোগযুক্ত অবস্থায় বসা। মাম্মার তপস্যা দেখে আমি ভীষণ প্রেরণা পেতাম।

মাম্মা ভীষণ কম কথা বলতেন

মাম্মার মুরলীর ক্লাসে আমরা মূর্তিবৎ তন্ময় হয়ে যেতাম। মুরলী দেড়ঘণ্টা চলত, আমরা একাগ্র হয়ে বসে শুনতাম। পুরো যজ্ঞে যদি তাঁকে দেখা যায় তো দেখব তিনি খুব কম কথা বলতেন। মাম্মার এই স্বল্পভাষী গুণ আমার খুব ভালো লাগত। ওই সময়ে আমিও খুব কম কথা বলতাম। অন্তর্মুখতার প্রেরণা আমি মাম্মার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। অন্যের সাথেও আমি খুব একটা মিশতাম না। কখনো কখনো দিদির সাথে কম-বেশি কথা বলতাম। কথায় কথায় দিদিকে বলেছিলাম, আমি মাম্মাকে ভয় পাই,এই নয় যে আমি ভুল করি, এমনিতেই ওনার কাছে যেতে আমার সংকোচ লাগে। বিষয়টা মাম্মার গোচরে এসেছে। একদিন মাম্মা আমার হাত ধরে বললেন, জনক, তুমি আমাকে ভয় পাও? আমি বললাম, ভয় পাইনা, কিন্তু কথা বলা হয় না এজন্যই বলে ফেলেছি। মাম্মা বললেন, চলো আজই তোমার সঙ্গে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হবে, মাম্মা প্রত্যেকের সাথে প্রেম ও শ্রদ্ধা সহ কথা বলতেন বলে সবার মন ভরে যেত।

মাম্মা মুখে বলে নয়, করে শেখাতেন

মাম্মা বলতেন যে ভুল একবার হয়েছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। আমিও গাঁট বেঁধে নিয়েছিলাম আমার রেকর্ড এমন রাখব যা মাম্মার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার শিখতে না হয়। মাম্মা কখনো শুধু মুখে বলে শেখাতেন না, তিনি নিজে হাতে-কলমে করে শেখাতেন। একবার ভোর ৪টেতে উঠিনি। মাম্মা ৪টের সময় এসে দেখতেন, কেউ যদি না উঠত তা দেখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরে চলে যেতেন, কেউ না কেউ তাঁকে দেখে ফেলত, সে এসে বলত, মাম্মা কিন্তু দেখে গেছেন। তো আমরা সবাই উঠে প্রস্তুত হয়ে মাম্মার সামনে গিয়ে হাজির হতাম। তখন মাম্মা স্মিত হাসি হেসে বলতেন, দেখো মন্দিরে তোমাদের ভক্তগণ উঠে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন আর তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে? সেদিন

থেকে আজ পর্যন্ত অমৃতবেলায় শুয়ে থাকিনা।

মাম্মা সব সময় 'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা' বলেছেন

ভোজন কী হয়েছে, কেমন হয়েছে - মাম্মা কখনো এসব দেখেননি। যা হোত তা হৃদয় দিয়ে স্বীকার করে নিতেন, কখনো তিনি বলেননি আজ নুন কম হয়েছে বা বেশি হয়েছে, তরকারি ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে। খাওয়ার সময় মাম্মা কখনো এদিক-সেদিক দেখতেন না। নীরবে বসে খেতেন, তারপর চলে যেতেন। ভোজনকে তিনি প্রসাদ রূপে স্বীকার করতেন। মাম্মার সামনে বাবা যা কিছুই বলুন না কেন, মাম্মা কখনো কেন, কীভাবে এসব চিন্তাতেই আনতেন না। সব সময় মাম্মা আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা বলতেন। বাবার প্রতি তাঁর এমনই সম্মানবোধ ছিল। আমি যখন পুনাতে ছিলাম তখন মাম্মা আমাদের কাছে তিনবার এসেছিলেন। বাবার প্রতিটি কথায় মাম্মার অটুট বিশ্বাস ছিল। কেউ একবার মাম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মাম্মা, বাবা প্রথমে বলতেন, যেখানে জিত সেখানে জন্ম। আজকাল সে সম্বন্ধে আর কিছু বলেন না । আপনার সিদ্ধান্ত কী? এর প্রেক্ষিতে মাম্মা বললেন, আমার আলাদা সিদ্ধান্ত কোথা থেকে আসবে? বাবা যা বলেছেন ওটাই আমাদের সবার সিদ্ধান্ত। মাম্মা কখনই নিজের বুদ্ধির অভিমান দেখাননি।

মাম্মার সামনে বাবা যা কিছুই বলুন না কেন, মাম্মা কখনো কেন, কীভাবে এসব চিন্তাতেই আনতেন না

মনোজিৎ মাম্মা

পুনাতে কেউ একজন একবার মাম্মার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মাম্মা আপনি কীভাবে মনকে শান্ত রাখেন? মাম্মা বলেছিলেন, মন আমার ছোট্ট শিশু, আমি তাকে বলে দিই এখন তুমি শান্ত থাকো, যখন প্রয়োজন হবে তখন তোমাকে ডেকে নেব। আমার কথামত সেও বসে থাকে। এরকমই মাম্মা মনোজিৎ ছিলেন। করাচীর কথা মনে পড়ছে, মাম্মা অফিসে বসে ছিলেন, আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম, মাম্মা আমি কী পুরুষার্থ করব? মাম্মা বললেন, সব সময় বুঝবে এটাই আমার অন্তিম সময়। সেদিন এবং আজও মাম্মার সেই মন্ত্র ভুলিনি। ভুলিনি, বাবার স্মরণেই থাকতে হবে।

গুপ্তগামিনী মা সরস্বতী

মাম্মা কখনো 'নিজেকে দেখানো' ব্যাপারটি করেননি। কী ভীষণ রকম সেবা করতেন, কিন্তু কখনো নিজের মুখে বলেননি, আমি এত সেবা করেছি। দেড়মাস সেবা করে মাম্মা ব্যাঙ্গালোর থেকে পুনাতে এসেছেন। যে ভাই ওনাকে আনতে গেছিলেন সেই ভাই কিছু শুনিয়ে ছিলেন, তার প্রেক্ষিতে আমি মাম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মাম্মার কোন হেলদোল ছিল না। তিনি খুব সাধারণভাবে বললেন, সেবা ভালোই হয়েছে। ব্যাস্, এটুকু মাত্র। মাম্মা এভাবে নিজের সম্বন্ধে বা নিজের সেবার সম্বন্ধে অন্য কারো কাছে কিছু বলতেন না। তিনি যতখানি ত্যাগী, ততখানি বৈরাগী ও তপস্বী ছিলেন। মাম্মাকে আমি 'রাধে' রূপে দেখেছি, 'সরস্বতী' রূপে দেখেছি, 'কালী' রূপে ও 'জগদম্বা' রূপেও দেখেছি।

শিক্ষাদানের অনন্য বিধি

বাবা, সভার মাঝে অর্থাৎ ক্লাসে সবার সামনে বুঝিয়ে দিতেন। কাউকে ব্যক্তিগত শিক্ষা

দেওয়ার প্রয়োজন হলে তাকে চিঠি লিখে দিতেন। কিন্তু মাম্মার বোঝানোর কৌশল ব্যতিক্রমী ছিল। মাম্মা কানে কানে বলে দিতেন বা ইশারা করে দিতেন এবং দারুণ স্নেহে বলে দিতেন। কারো কথা শুনে তার উপর ভিত্তি করে মাম্মা কাউকে শিক্ষা দিতেন না। মাম্মা সময় দিয়ে স্নেহ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন আর আশ্চর্য বিষয় ছিল শিক্ষার্থী অনুভবই করতে পারত না কারো নালিশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা দিচ্ছেন। মাম্মার শিক্ষাকে যজ্ঞবৎসগণ নিজের মায়ের শিক্ষা হিসাবে ধরে নিতেন। প্রত্যেকেই অনুভব করত মাম্মা যা বলছেন তা আমার ভালোর জন্যই বলছেন। বাবার শিক্ষা বেশ শক্তিশালী ছিল কারণ বাবার 'বলা' শোনা এবং 'বোঝার' জন্য শক্তি চাই । শক্তিশালী আত্মাই বাবার শিক্ষা হজম করতে পারে। সাধারণ ভাবে কোন বাচ্চাকে কিছু বলার প্রয়োজন হলে বাবা সরাসরি ওই বাচ্চাকে না বলে তার সামনেই মাম্মাকেই বলতেন, ওই বাচ্চা বুঝে নিত আমার জন্যই মাম্মাকে এতসব শুনতে হলো। মাম্মার কাছেই ওই বাচ্চা নিজের ভুল স্বীকার করত এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সাবধান থাকত।

শ্রদ্ধা ও অনুশাসনের জননী মাম্মা

মাম্মা কখনো বাবাকে সাধারণ রূপে দেখেননি। বাবার প্রতিটি নির্দেশ পূর্ণাঙ্গরূপে সম্মান দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। কোন কোন সন্তান বাবার কথাকে খুব সাধারণভাবে নিত। তো মাম্মা সব সন্তানকে একত্র বসিয়ে বুঝিয়ে বলতেন, বাবাকে সাধারণ ভেবে মারাত্মক ভুল করো না। বাবার এক-একটি বাক্য মহামূল্যবান। এরকম বলে মাম্মা আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুশাসন শেখাতেন। মাম্মার বক্তব্যের মধ্যে দারুণ সম্মান, স্নেহ ও মধুরতা থাকত। মাম্মা আমাদের নিয়ম-রীতি, শালীনতা, সংস্কৃতি শিখিয়ে মজবুত করে গুণ দিয়ে সাজিয়ে বাবার সামনে রেখেছেন।

মাম্মার মধ্যে নম্রতা এতটাই ছিল বাবা যখন বলতেন - 'মাতপিতাকা ইয়াদ-পেয়ার অর নমস্তে' তখন মাম্মা নিজেকে মাতা ভাবতেন না

যজ্ঞমাতা রূপে মাম্মা

আমি যখন থেকে মাম্মাকে দেখেছি তখন থেকেই মাম্মার মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীর সব গুণ দেখতে পেতাম। মাম্মা সর্ব দৈবীগুণে সম্পন্না ছিলেন। মাম্মার দেহবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাসের দিকে সব সময় নজর ছিল। অশরীরী হওয়ার মাম্মার অভ্যাস আমাদের কাছে ছিল ভীষণ অনুকরণীয়। মাম্মার সামনে কেউ কিছু বলার জন্যে এলে হয় তার বাক্‌রোধ হয়ে যেত নতুবা বেশি বলতে পারত না। 'পিওরিটির পার্সোনালিটি' রয়্যালিটি, ত্যাগ, দায়িত্ববোধে তিনি সদা এক নম্বরে ছিলেন। এত ছোট বয়সে নিজের মধ্যে এত বিশাল পরিবর্তন করে নেওয়া মাম্মার এক মহানতম বিশেষতা। বাবার কর্তব্যপরায়ণা 'মেয়ে' হিসেবে এবং আমাদের সকলের অলৌকিক 'মা' এই দুটো ভূমিকা মাম্মা হৃদয় দিয়ে পালন করেছেন। মাম্মার মুখ থেকে যে বাক্য নির্গত হয়েছে, যে পরামর্শ তিনি দিয়েছেন তা শ্রোতার কাছে 'বরদান'-এ পরিণত হয়েছে। সবার অনুভব হতো এর মধ্যে মাম্মার বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই, আমার ভালোর জন্যই তিনি এত পরিশ্রম করছেন। পিতামহ এমনকী প্রপিতামহ তুল্য বয়স্করাও মাম্মাকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করতেন।

মাম্মার রুহানী রূপ

মাম্মা প্রত্যেকদিন অবশ্যই মুরলী পড়তেন বা টেপরেকর্ডার দ্বারা শুনতেন। রাত যতই ১১টা বাজুক না কেন, তিনি পরের দিনের মুরলী শুনে তবেই ঘুমোতে যেতেন। যেমন,

নিজের কর্তব্যের প্রতি দারুণ দৃঢ় ছিলেন, ঠিক তেমনি ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ নিষ্ঠা। হসপিটালে থেকেও তিনি রোজ মুরলী শুনতেন। মাম্মাকে আমি সর্বদা অ্যালার্ট ও অ্যাকুরেট দেখেছি। কখনো মাম্মার চোখে ক্লান্তি দেখিনি। সবসময় তাঁর চোখ বাবার স্মরণে মগ্ন দেখেছি। মাম্মার মধ্যে নম্রতা এতটাই ছিল বাবা যখন বলতেন - 'মাতপিতাকা ইয়াদ-পেয়ার অর নমস্তে' তখন মাম্মা নিজেকে মাতা ভাবতেন না। উপরে ইশারা করে বলতেন, ওই 'মাতপিতাকা ইয়াদ অর পেয়ার'। মাম্মা কেবল দায়িত্ব পালন, বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য নিজেকে 'মাতা' ভাবতেন। মাম্মা 'মা'-এর পদ স্বীকার করেননি কিন্তু মায়ের কর্তব্য স্বীকার করে তা পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করেছেন। বাবার সামনে মাম্মা এক ছোট্ট আদরের অতি স্নেহের সন্তানের রূপ ধারণ করে নিতেন আর যজ্ঞবৎস এবং ভক্তদের সামনে আদি দেবী জগদম্বা মায়ের রূপে ধরা দিতেন। এমনই মহতী ছিলেন আমাদের সরস্বতী মা।

সন্তুষ্টতাই সম্পন্নতা

দুর্ভিক্ষ চলছে, মানুষ খেতে না পেয়ে মরতে শুরু করেছে। ওই এলাকার জমিদার ঘোষণা করে দিয়েছেন, বাচ্চাদের তিনি রুটি বিতরণ করবেন। এ খবর শুনে সমস্ত বাচ্চা হাজির হয়েছে। জমিদার প্রত্যেককে দুটি করে রুটি দিয়েছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে সে খুব ভোলাভালা, একান্তে দাঁড়িয়ে থাকে সে। যখন তার নেওয়ার সময় আসে সে এসে সবার শেষে সবচেয়ে দুটো ছোট রুটি নেয়। প্রতিদিন এরকমই শান্ত থেকে সবার শেষে রুটি নিয়ে খুশিতে খুশিতে সে তার মাকে নিয়ে দেয়। সে আর তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। দুজনেই দুটো রুটি খেয়ে ভগবানের গুণগান করতে করতে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে চলতে চলতে একদিন যথারীতি মেয়ে রুটি নিয়ে ঘরে এসেছে। মা রুটি ছিঁড়ে দেখে তার মধ্যে ছোট ছোট তিনটে সোনার দানা। মা সোনার দানা পেয়ে মেয়েকে বলল, মা তুমি জমিদারকে গিয়ে সোনার দানাগুলো দিয়ে এসো।

মেয়ে রাজি হয়ে তৎক্ষণাৎ সোনার দানাগুলো নিয়ে জমিদারের কাছে হাজির। বলল, বাবুজি, এই আপনার সোনার দানা। জমিদার হতবাক হয়ে ভাবলেন, এই মেয়ে কী করে সোনার দানা নিয়ে এল। জমিদার সব শুনে অপলক দৃষ্টিতে ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। জমিদার জানতেন মেয়েটি সবার শেষে সবচেয়ে ছোট রুটি নেয়।

জমিদার দারুণ স্নেহে বললেন, মা, তুমি এগুলো নিয়ে যাও, এ তোমার সন্তুষ্টতারই ফল। মেয়েটি বলল, বাবুজি, সন্তুষ্টতার ফল তো আমি প্রথমেই পেয়েছি। ধাক্কা না খেয়ে একান্তে দাঁড়িয়ে রুটি নেওয়ার সুযোগ। জমিদার বুঝলেন, বাচ্চা তো ছোট কিন্তু তার চিন্তাভাবনা তো অনেক উঁচু। জমিদারের অনেক বলার পর সোনার দানা নিয়ে মেয়েটি ঘরে ফিরেছে। জমিদার এরপর অনেক চিন্তাভাবনা করে মেয়ে আর তার মাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। মেয়েকে ধর্মপুত্রী করে নিজের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে নিলেন। কারণ জমিদার সন্তানহীন হওয়ার জন্য তাঁর একটি সন্তানের প্রয়োজন ছিল। বলা হয়, স্থূল ধনের চেয়ে 'সন্তুষ্টতারূপী ধন' শ্রেষ্ঠ। তাই ওই বাচ্চাকে সন্তুষ্টতার ফলই প্রাপ্তি করিয়েছে।

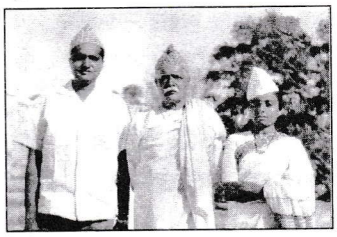

পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ও ড্রামার জ্ঞান

- ব্রহ্মাকুমার রমেশ, গামদেবী (মুম্বাই)

পরমপিতা পরমাত্মা শিব, পরম শিক্ষক ও পরম সদ্‌গুরু। পরমশিক্ষক রূপে তিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান দান করেন। সর্বোচ্চ লোক 'পরমধাম', যেখান থেকে আমরা, আত্মাগণ এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে শরীর ধারণ করে অভিনয় করার জন্য আসি, অভিনয় শেষ হলে আবার আমরা পরমধামে ফিরে যাই। দ্বিতীয় লোক সূক্ষ্মলোক। এরও পরিচয় ভগবান শিব দেন। পরমধাম শব্দ গীতায় আছে। আমরা যখন শিববাবার থেকে পরমধাম বা ব্রহ্মলোকের জ্ঞান শুনেছি তখনই চিন্তার মধ্যে এসেছে গীতায় তো ১৫তম অধ্যায়ে পরমধাম শব্দ আছে। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ সবে তখন বুঝলাম। বিভিন্ন ধর্মাচার্য, বিদ্বান, পণ্ডিত ১৫তম অধ্যায়ের পরমধাম শব্দের অর্থ লিখেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই লেখেননি যে পরমধাম সকল আত্মার 'স্বদেশ'।

এভাবে ইতিহাসে অনেক নতুন বিষয় ভগবান আমাদের শিখিয়েছেন শেক্সপিয়ার লিখেছেন, এই পৃথিবী এক রঙ্গমঞ্চ আর আমরা সব 'অভিনেতা-অভিনেত্রী'। এক গ্রীক দার্শনিক লিখেছেন এই 'সৃষ্টিচক্র' প্রতি ১০ হাজার বছর অন্তর হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়। আর এক বিদ্বানও লিখেছেন 'কল্প'-এ সৃষ্টির ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু এঁদের মান্যতা আর ভগবান শিববাবার প্রদত্ত জ্ঞানের জমিন-আসমানের ফারাক লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, কোন এক বিদ্বানকে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ প্রতি কল্পে কি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' তৈরি হয়? তো বললেন, হ্যাঁ হয়। আবার জিজ্ঞাসা করলাম রামায়ণের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের প্রসঙ্গ কেন ? বিদ্বান বললেন, রামায়ণ আর মহাভারত তো একই আছে, কিন্তু রামায়ণের লেখকদের কোন কোন বিষয় ভালো লেগেছে, কোন কোন বিষয় ভালো লাগেনি। এরই ভিত্তিতে সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে মার্গদর্শন দেওয়ার জন্য অনিবার্য মনে করে রামায়ণের মধ্যে সংযোজন করে দিয়েছেন। ওই সব পণ্ডিতদের ভগবান শিবের ড্রামার হুবহু পুনরাবর্তনের জ্ঞান যখন শোনালাম তাঁরা শুনে হকচকিয়ে গেলেন, বলতে লাগলেন তাহলে 'পুরুষার্থ' (আন্তরিক প্রয়াস) করার প্রয়োজন কী ? শিববাবার জ্ঞানের ভিত্তিতে বললাম, ড্রামাতে আমার অভিনয় কী আছে তা আমার জানা নেই। তবে আমি ভাবি আমার অভিনয় শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম হবে তাই শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ তৈরির জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করে চলেছি। সহজ করে বলতে গিয়ে বললাম, গাড়িতে বসে একই পা দিয়ে গাড়ির গতি তীব্র করা যায় আবার ব্রেকও কষা যায়। দক্ষ ড্রাইভার জানে কখন ব্রেক কষতে হবে আর কখন অ্যাক্সিলারেটর চাপতে হবে।

ড্রামার জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থে তীব্রতা আনার জন্য ব্রহ্মাবাবা আমাকে দারুণ যুক্তি দিয়েছেন। একবার আমি আর দাদি প্রকাশমণিজি মুম্বাই থেকে মধুবনে এসেছি, ব্রহ্মাবাবা ওয়ার্ল্ড রিন্যুয়াল স্পিরিচুয়াল ট্রাস্ট নির্মাণের জন্য আমাদের চারজনকে নিয়ে কমিটি গড়ে দিলেন। বড়দিদি, দাদি প্রকাশমণিজি, দাদা আনন্দ কিশোরজি আর আমি। কমিটি তৈরির পর প্রসঙ্গ এলো ট্রাস্টের 'ম্যানেজিং ট্রাস্টি' কে হবেন? সবাই বললেন রমেশ ভাই হবেন। আমি ব্রহ্মাবাবাকে বললাম, বাবা ট্রাস্টের কাজকারবারের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই, আমি তো ইনকাম্ ট্যাক্সের উকিল, শুধু ওই সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা আছে, আপনি বরং অন্য কাউকে দায়িত্ব দিন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ম্যানেজিং ট্রাস্টি করুন

আমি তাঁকে আইনের দিক থেকে সহায়তা করব। এর প্রেক্ষিতে ব্রহ্মাবাবা বললেন, না বৎস, পূর্বকল্পে তুমিই ম্যানেজিং ট্রাস্টি হয়েছিলে। এখন তোমাকেই হতে হবে আর প্রতি কল্পে তুমিই হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি আবার বললাম, আমার তো একাজ করার অনুভবই নেই তাহলে কীভাবে করব? বাবা ড্রামার জ্ঞানকে সদুপযোগ করার সরল যুক্তি বললেন, যখন কোন বিষয় নির্ণয় করতে গিয়ে সন্দেহ বা দ্বিধা আসবে তখন দু'মিনিট বাবার স্মরণে বসে যাও, পূর্বকল্পের স্মৃতি কালকের স্মৃতি মনে করে স্মরণ করো। এই স্মৃতি দ্বারা সবচেয়ে সেরা নির্ণয় নিয়ে ট্রাস্টের কাজ চালাতে পারবে। আমার অনুভব ১৯৬৯ থেকে প্রায় ৪৪ বছর ট্রাস্টের কার্যকলাপ পূর্বকল্পের স্মৃতির বল আর প্রিয় বাপদাদার সহযোগ দ্বারা চলছে। এ পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা সবই নির্বিঘ্নে সফল হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে হাপুড় সেবাকেন্দ্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের অতি প্রিয় মাতেশ্বরীজি সেখানে গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে মধুবনে ফিরে এসেছেন। মাতেশ্বরীজির থেকে সমস্ত সংবাদ শুনে আমি ব্রহ্মাবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা এরকম সংবাদ শুনে আপনার কোন চিন্তা হচ্ছে না? এরকম বিপরীত পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে নিজেকে 'একরস' রাখেন? ব্রহ্মাবাবা বললেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস পাঁচহাজার বছর পূর্বে স্থাপনার সময় এরকমই সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। পূর্বকল্পে যেমন ভাবে আমরা বিজয় প্রাপ্ত করেছিলাম এবারও একই ভাবে করব। এভাবেই ড্রামার হুবহু পুনরাবৃত্তি ও শিববাবার আশীর্বাদের উপর পুরো ভরসার কারণে আমার স্থিতির কোন হেলদোল হয় না। ব্রহ্মাবাবার একথা শুনে আমারও 'নিশ্চয়' হয়েছে এবং উপলব্ধি করেছি এভাবেই প্রত্যেকটি সমস্যা শূল থেকে কাঁটা হয়ে যায়।

যখন কোন বিষয় নির্ণয় করতে গিয়ে সন্দেহ বা দ্বিধা আসবে তখন দু'মিনিট বাবার স্মরণে বসে যাও

মুম্বাইয়ে আমার এক বন্ধুর এক টুকরো জমি ছিল। ৩৫ হাজার টাকায় সে বেচে দেবে। ওই সময় মাতেশ্বরীজি মুম্বাইয়ে আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। আমি মাম্মাকে বললাম, যজ্ঞসেবার জন্য এই জমি কিনে নেব? মাতেশ্বরীজি রাজি হলেন না। মাস চারেক বাদে ওই জমিই যে ৩৫ হাজারে কিনেছিল সে ৭০ হাজার টাকায় বেচে দিয়েছিল। আমি মাতেশ্বরীজিকে বললাম, যজ্ঞসেবার জন্য এজমি কেনার আমাকে অনুমতি দিলে কত ভালো হত! দু-তিনবার রাত্রের খাবার টেবিলে হাসতে হাসতে এরকম বলেছিলাম। মাতেশ্বরীজি এর প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, রমেশ যে ঘটনা ড্রামাতে নেই সে ঘটনা চিন্তা করে কী লাভ। ড্রামাতেই নেই তাই আমিও অনুমতি দিইনি। এতেই কল্যাণ আছে। ড্রামার ভবিতব্য কল্যাণের ভেবে কাজ করলে ব্যর্থ চিন্তন ও হৃদয় দহনের বিষয়ই আসবে না।

সকলের প্রিয় দাদি হৃদয়মোহিনীজি যখন রাশিয়াতে ছিলেন তখন এক আত্মা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আপনি সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করেন? দাদিজি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন, আমি সমস্যাকে সমস্যা দেখিনা 'পরীক্ষা' দেখি। একজন সচেতন শিক্ষার্থী পরীক্ষাকে ভয় পায় না। সে জানে পরীক্ষা উঁচু শ্রেণিতে যাওয়ার সাধন মাত্র। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পরীক্ষা হল এগিয়ে যাওয়ার বা সফলতারই চাবি।

ড্রামার জ্ঞানের আধারে 'হয়তো', 'যদি', 'কিন্তু', 'কেন', 'কী', 'কীভাবে' ইত্যাদি শব্দ এবং এর প্রেক্ষিতে উৎপন্ন হওয়া চিন্তা শেষ হয়ে যায়। শাস্ত্রে এসব শব্দের জন্য অনেক ঘটনার বিস্তার হয়েছে। ধরা যাক্, রামায়ণে সীতা যদি লক্ষ্মণরেখা পার না করতেন তাহলে কী হত ? বালীকে বধ করার পরিবর্তে রাম যদি তাকে বন্ধু করে নিতেন তাহলে লঙ্কাকাণ্ডই হত না। যদি যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে না যেতেন তাহলে হয়তো মহাভারতের যুদ্ধের প্রয়োজনই হতো না। মাতা কুন্তী কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত যদি প্রথমেই সবাইকে জানিয়ে দিতেন তাহলে কর্ণ-পাণ্ডব হওয়ার জন্য মহাভারতের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন এবং তার ফলাফল অন্য রকম হতে পারতো।

বর্তমান ইতিহাসেও এরকম অনেক প্রশ্ন আছে। ঐতিহাসিক লিখেছেন, ওয়াটারলু যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সেনা লর্ড ওয়েলিংটনের কাছে পৌঁছায়নি ভেবে নেপোলিয়ন নিজের এক-তৃতীয়াংশ সেনা ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরের দিন লর্ড ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অস্ট্রিয়ার সেনা তো যুদ্ধস্থলে পৌঁছে গেছিল উপরন্তু নেপোলিয়নের সেনা কম থাকার জন্য সেই যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় হয়। ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন নেপোলিয়ন যদি এই ভুলটি না করতেন তাহলে বিশ্বের ইতিহাস অন্যরকম হতো। ঠিক এরকমই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলীন উইস্টন চার্চিলকে রাশিয়াতে প্রেরণ করলেন এবং মৃগ-মরীচিকার মত পরিস্থিতি তৈরি হল, হিটলার যদি ইংল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে রাশিয়া পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে জার্মানী জিতে নেবে, এজন্যই হিটলার ইংল্যান্ড ছেড়ে রাশিয়া আক্রমণ করে। রাশিয়ার ঠাণ্ডায় হিটলারের সেনা কাবু হয়ে পড়ে। এজন্যই ঐতিহাসিকগণ বলেন, হিটলার যদি রাশিয়া আক্রমণ না করত আর যদি ইংল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ করত তাহলে বিশ্বের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

প্রেমজির যদি প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব তার জাতি মেনে নিত তাহলে কী পাকিস্তানের রচনা হতো ?

এরকম ঘটনা, মহাত্মা গান্ধী এবং মহম্মদ আলি জিন্নাহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মহম্মদ আলি জিন্নাহর ঠাকুর্দা প্রেমজিভাই ঠক্কর হিন্দু লোহানা জাতির ছিল। রাজকোটের কাছাকাছি গোণ্ডল শহরে থাকতেন। জীবন নির্বাহের জন্য তিনি রাজকোটে চলে আসেন। এখানে মাছ রপ্তানি করা এক মুসলমান ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ওই ব্যবসায়ীর অধীন মুহুরীর কাজ করতেন এবং ভীষণ বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যবসায়ী এক মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তিনি বাধ্য হয়ে তার ব্যবসার দায়দায়িত্ব প্রেমজিভাই ঠক্করের উপর অর্পণ করেন। যতদিন না তার নিজের বড় পুত্র বড় না হয়ে ওঠে ততদিন সামলানোর কথা বলেন। প্রেমজিও দায়িত্ব নিয়ে সব সামলে নেন। কিন্তু বাধ সাধল তার নিজের সম্প্রদায়। তার লোহানা জাতি সমিতি তাকে লোহানা সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করল। প্রেমজি প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করলেন কিন্তু তার সম্প্রদায় মানল না। তাঁর চার পুত্র ছিল । তাদের বিয়ে দেবার জন্য বাধ্য হয়েই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হল। প্রেমজির এক পুত্র জিন্নাহ। জিন্নাহরই ছেলে হলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ, যার ইচ্ছায় পাকিস্তানের জন্ম হয় আর হিন্দুস্তানের নকশার পরিবর্তন হয়ে যায়। এবার প্রশ্ন হল প্রেমজির যদি প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব তার জাতি মেনে নিত তাহলে কী পাকিস্তানের রচনা হতো ? এবার আসি মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে। মহাত্মা গান্ধীজি মোহনদাস গান্ধী রূপে লন্ডনে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য পড়াশুনার লক্ষ্যে পাড়ি দিয়েছেন। বিদেশ যাত্রার জন্য

গান্ধীজির নিজের সম্প্রদায় গান্ধীজিকে দণ্ড দেওয়ার দাবি রাখে। গান্ধীজি রাজকোট গেলেন, প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যজ্ঞ-আদি করলেন এবং হিন্দু হিন্দুই থেকে গেলেন। যদি গান্ধীজির প্রায়শ্চিত্ত তাঁর সম্প্রদায় না মানতেন তাহলে তাঁকে বাধ্য হয়ে মুসলমান হতে হত। আর হিন্দুস্তানের ইতিহাস তাহলে অন্যরকম হতো।

যদি গান্ধীজির প্রায়শ্চিত্ত তাঁর সম্প্রদায় না মানতেন তাহলে তাঁকে বাধ্য হয়ে মুসলমান হতে হত

ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রকারদের ড্রামার জ্ঞান না থাকার কারণে নিজেরা অন্ধকারে এবং অন্যদেরও অন্ধকারে ফেলে দেন। ইংল্যান্ডের দুই লেখক ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছেন যে, মহম্মদ আলি জিন্নাহের ক্যান্সার ছিল তাই তিনি ফোর্স করেছিলেন ভারতের দ্রুত বিভাজনের, যাতে করে পাকিস্তান খুব তাড়াতাড়ি জন্ম নেয়। যদি ওই সময় হিন্দুস্তানের নেতৃবৃন্দ জিন্নাহের রোগের কথা জানতেন তাহলে বিভাজনের প্রস্তাব স্থগিত করে দিতেন। তাহলে ভারত আর পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

শিববাবার ড্রামার জ্ঞানের ভিত্তিতে আত্মাদের এরূপ অনেক রকমের জিজ্ঞাসা দূর হয়ে গেছে। জ্ঞানকে সঠিক প্রয়োগ করে তীব্র পুরুষার্থ সহজ হয়েছে। আমার দৈবী পরিবারের সব সদস্যের প্রতি আবেদন শিববাবার দেওয়া জ্ঞান সঠিক প্রয়োগ করে পুরুষার্থ তীব্র করে শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হোন।

প্রণব প্রণিধি

- ব্রহ্মাকুমার সুজিত
গড়বেতা সেন্টার
রাধানগর, পঃ মেদিনীপুর

শিববাবা, তুমি তো সকল লোকের প্রিয়
কিন্তু হে কল্যাণময় ঈশ্বর, সকলের থেকে
তুমি তো কত আলাদা ।
হে সখা, হে বন্ধু, হে মোদের খোদাবন্দ্
তুমি যে ভোলানাথ, অনাথের নাথ।
সকলে ভাবে তুমি একান্ত তাহারি,
তুমি তো জান প্রভু, তুমি সকলেরি।
কল্পতে তুমি একবারই আস
নূতন পৃথিবীর স্থাপনা, আর পুরাতনের বিনাশকালে।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়েও,
হে ঈশ্বর, তুমি না কতই নিরহংকারী।
মায়ার শিকলে বন্দী আমরা
হে মুক্তিদাতা, হে পেশল (সুন্দর)
চূর্ণ করো এই কঠিন শিকল।

তুমি যে সমস্ত আত্মার পিতা
পরমাত্মা এক ও নিরাকার।
বাস করি মোরা একসাথে, পরমধামে,
তাই তো তুমি যে মোদের দুঃখহর্তা, সুখকর্তা।
হে নিরুপম, কতই না সূক্ষ্ম তোমারি কর্মধারা !

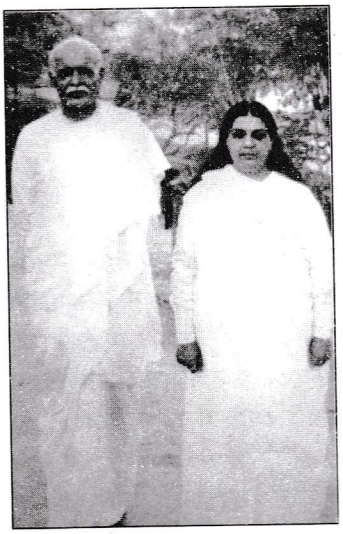

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

এক অনন্যসাধারণ সৎসঙ্গ

দাদা বাইরে যাওয়া বন্ধ করলেন। তাঁর পরিবারবর্গ, বন্ধুমহল, প্রতিবেশী যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দাদার চারপাশে বসে আত্মার সুগভীর জ্ঞান দাদার মুখ থেকে শুনতেন। তাঁর কথাতে প্রচণ্ড শক্তি ছিল এবং তাঁর শ্রোতারা এসব অত্যাশ্চর্য ধারণার উপর মনন চিন্তন করে, হালকা ও খুশী অনুভব করতেন।

অল্প সময়ের ভিতরই এই বার্তা দূরের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছায় এবং তারাও দাদার কাছে আসতে শুরু করেন। তারা পরিবেশে এক উদ্দীপ্ত স্পন্দন এবং উষ্ণতা, প্রেম ও শক্তির স্পন্দন সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতেন। তারা ক্রমশঃ বুঝতে লাগলেন, ঈশ্বর স্বয়ং তার সত্যজ্ঞান দান করার জন্য দাদার শরীরকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছেন।

শিববাবা, নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, কেননা, নারীরাই তাদের সমাজের রীতিপ্রথার দ্বারা অত্যাচারিতা হয়েছিলেন। তিনি তাদের নানারূপ বাধা নিষেধের শৃঙ্খল অতিক্রম করার শক্তি ও উৎসাহ দেন এবং তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে অনুভব করার সুযোগ তৈরি করে দেন। পুরুষ ও নারী - যারাই আসতেন, তারা কখনও শ্রীকৃষ্ণ, কখনও সত্যযুগ স্থাপনা, কখনও কলিযুগী অপবিত্র পৃথিবীর আসন্ন বিনাশের চিত্রাবলীর দর্শনলাভ করতেন।

এই সব দর্শনের কাহিনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শীঘ্রই শহরের সব ব্যক্তিই শুনতে পেল যে, দাদার সৎসঙ্গে দিব্য দর্শন হয়। এর সত্যতা জানার জন্য অনেকেই আসতে লাগল।

নবাগতরা, অত্যাশ্চর্য ও আনন্দঘন অনুভূতি পেত, কিন্তু তারা ভাবত এসব দাদার জন্যই হচ্ছে। তাহাদের বোঝার ক্ষমতা হয়নি, স্বয়ং পরমপিতা এসব ঘটনার পেছনে আছেন এবং তিনিই দাদার মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা তাদের শোনাচ্ছেন। শুরুতে দাদাও দর্শনাদির ব্যাপারে স্পষ্ট ছিলেন না, পরে এই সব তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়।

অনেকেই যারা এই সৎসঙ্গে আসতেন, তাদের মাঝে, রুক্মিনী নামে এক অতি ধনী পরিবারের মহিলাও ছিলেন। তার শ্বশুর স্থানীয় সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। রুক্মিনীর স্বামী সম্প্রতি দেহত্যাগ করায় তিনি খুবই নিরানন্দে ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে নিশ্চয় দিয়ে বললেন যে, দাদার সৎসঙ্গে গেলে তিনি শান্তি পাবেন। দ্বিধাচিত্তে তিনি সেখানে গিয়ে দাদার সামনে বসে শুনতে লাগলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার মাঝে এক পরিবর্তন এল। দাদার আচরণ ও ভাষণ তাকে এক নতুন সাহস যোগায়। গভীর আনন্দ নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন এবং তার পরিবারের সকলকে এরপর তার সঙ্গে যেতে বললেন, "চল, ওম্‌বাবাকে দেখতে যাই" - তিনি বললেন। "তাঁর গুপ্ত শক্তি আছে। তাঁর ভাষণ যেন অমৃতময়। তিনি আত্মাকে শান্তি দিয়েছেন। এক প্রভা যেন তাঁর মুখমণ্ডলকে বেষ্টিত করে আছে এবং তাঁর দৃষ্টি এতই শক্তিশালী যে, যে কোন অশান্ত, অস্থির আত্মাও শান্তি ও আনন্দ অনুভব করে।

পরিবারের লোকেরা রুক্মিনীর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। রুক্মিনীর এক কন্যা, গোপী, এরপর তার সঙ্গে গেলেন। ওম্ বাবাকে এক দৃষ্টিতেই তিনি তার মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করলেন। পরমাত্মা গুপ্তভাবে বাবার শরীরে আসছেন। সত্যিকারের সত্যসন্ধানীর কাছে তিনি বেশিদিন গুপ্ত থাকতে পারবেন না।

গোপী অনেক দর্শনলাভ করেন এবং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মা উপলব্ধি করেন। তিনি অনুভব করলেন, তিনি ঈশ্বরের গোপী হয়ে গেছেন অর্থাৎ তার প্রেমী হয়ে গিয়েছেন এবং যাঁকে তিনি এতদিন খুঁজেছেন তাকে পেয়ে গেছেন। তিনি দিদি মনমোহিনী নামে পরিচিত হলেন এবং পরে দাদি প্রকাশমণিজির সহ-পরিচালক রূপে ইং ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

জ্ঞানের পর সমাধি

বাবার সৎসঙ্গ, যা ওম্মণ্ডলী নামে পরিচিত হয়, সেখানে অনেক পুরুষ, মহিলা শক্তিশালী অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনঃবিবরণ প্রায় অসম্ভব। দাদি হৃদয়পুষ্পাজির নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়।

সত্যিকারের সত্যসন্ধানীর কাছে তিনি বেশিদিন গুপ্ত থাকতে পারবেন না

"বাল্যকাল থেকেই, আমার স্মরণে আছে, যখনই কোন আত্মীয়দের মাঝে বিবাহের খবর পেতাম, আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু কেন এরূপ বোধ করতাম তার কোন ধারণা ছিল না। এবং যখন আমার বিবাহ স্থির হয় এবং দিন এগিয়ে আসে, আমি অনবরত কাঁদতে লাগলাম।

"অবশেষে, আমার বিবাহের দিন উপস্থিত হল, কিন্তু আমার মনে হল, এ আমার মৃত্যুর দিন। কিন্তু পালাবার তো পথ নেই। সৌভাগ্যবশতঃ আমার স্বামী আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ছিলেন এবং তার মনে ভোগ-লালসার বৃত্তি ছিল না। সুতরাং আমরা শান্তিতেই একসঙ্গে থাকতে লাগলাম। স্বামী অসুস্থ হলে সেবিকারূপে আমি তার সেবা করি। কিন্তু আমাদের জীবনে যৌনসম্পর্কের কোনরূপ চিন্তা ছিল না।

"ডাক্তারি চিকিৎসা ও বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও আমার পতির অবস্থার অবনতি হতে লাগল। বিবাহের ছ'মাসের পর তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার পিতামাতা হতাশাগ্রস্ত হলেন। আমি বিড়ম্বনা বোধ করতে লাগলাম, কেননা অল্পসময় পূর্বে আমি স্বাধীন ও অবিবাহিতা ছিলাম এবং এখন লোকেরা আমাকে বিধবারূপে দেখবে। আমার ভাই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায়, আমার পিতামাতা সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আমার ভাই পিতামাতার নয়নের মণি ছিল। এখন তো তারা আরও বিপর্যস্ত। তাদের এরূপ হতাশা আমার দুঃখ বৃদ্ধি করে। আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের খবর হায়দরাবাদের অনেকের কাছে পৌঁছায়। কেননা পরিবার ছিল সম্পদশালী ও সুবিখ্যাত। পরে বাবা আমাদের কাহিনি শুনতে পান।

(ক্রমশঃ)

দুনিয়ার বিনাশ নয় কলিযুগী কালচারের বিনাশ

- ব্রহ্মাকুমারী শিবানী

২০১২ সালের ২১ ডিসেম্বর নিয়ে বহুক্ষেত্রে বহুরূপে আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা, অজানা অসীম ভয় পেয়ে বসেছিল। কী হয়! কী হয়! কেউ কেউ বলেছেন, যা হবে দেখা যাবে। যা সবার হবে তা আমারও হবে। কিন্তু এসব ধারণা বা অঙ্ক কষা তো মানুষের তৈরি ছিল। তার তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য হবে কী হবে না-এর একটা প্রশ্ন চিহ্ন থাকে অনেক ক্ষেত্রে।

কিন্তু যিনি সর্বোচ্চ বিজ্ঞানী, সর্বোচ্চ গণিতজ্ঞ এই বিশ্বনাট্যের নির্দেশক তিনি, বিশ্বমানবের হাহাকার ও চিৎকার শুনে পৃথিবীতে অবতরণ করে জানালেন, আশ্বস্ত করলেন, এই সৃষ্টি ধ্বংস হয় না, প্রলয় হয় না। ধ্বংস হয় কলিযুগী কালচার অর্থাৎ কলিযুগীয় চিন্তা, আচার, ব্যবহার। যা সৃষ্টির পুরনো হওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে। এর ফলস্বরূপ পাপাচার ভ্রষ্টাচার, ব্যাভিচার প্রভাব বিস্তার করে সর্বব্যাপী। দুঃখ, অশান্তি, ভয় নিয়ে নিরানন্দ জীবন সর্বস্ব হয় বিশ্বসমাজের। এই দুর্গতিপূর্ণ বিশ্বসমাজের বিনাশ নিশ্চিত। এই বিনাশকে কেউ রুখে দিতে পারবে না। এরপরই সত্যযুগী দুনিয়া স্থাপন হবেই । এর জন্য চাই মহান প্রস্তুতি। প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হল 'চিন্তাধারা'। এই চিন্তাধারাকে বদল করা আশু কর্তব্য। চিন্তার ফসল হল ব্যবহার। পুরনো চিন্তার ব্যবহারও পুরনো হয়ে গেছে। সম্পৃক্ত হয়ে একে অপরকে এ পর্যন্ত যা উপহার দিয়েছে তা পরিবর্তন করে মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

এখন আর কাউকে ছোট করে দেখা নয়, হিংসা নয়, চাই পরস্পরের প্রতি সম্মান ও প্রেম ভাবনা। এখান থেকেই সূচনা হবে সত্যযুগী দুনিয়ার। সকল আত্মার পিতা পরমাত্মার সন্দেশ হল - দুঃখ, কলহ, অশান্তি ও দুর্ভাবনা রহিত দিনচর্চার দ্বারা সত্যযুগী দুনিয়ার স্থাপন হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন, তোমরা সব আমার সন্তান, কোন মাতাপিতা তাঁর সন্তানের ভাগ্য খারাপ দেখতে চান না। একটি মহান মিথ্যা কথা 'ভগবান ভাগ্য লিখে দেন'। প্রকৃত সত্য হল আমাদের কর্ম দ্বারাই আমাদের ভাগ্য তৈরি হয়। শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল শ্রেষ্ঠ হয়। এই বিষয়কে আমাদের স্মরণে রাখা খুব প্রয়োজন। কৃত্রিমতা, হিংসা পৃথিবীর সুস্থ সংস্কৃতিকে টলিয়ে দিয়েছে। এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কৃত্রিমতা ও হিংসার লাল চোখ সর্বত্র থাবা বসিয়েছে। পাপাচার, ভ্রষ্টাচার সদর্পে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের চিন্তাধারায় প্রেম, পবিত্রতার বহমান স্রোত তৈরি করে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। এজন্য চাই শক্তি ও পবিত্র জ্ঞান। এই দুই-এরই দাতা পরমপিতা পরমাত্মা। মনবুদ্ধিকে একাগ্র করে প্রথমে আত্মাকে চিনতে হবে। পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মা পিতার থেকে সম্বন্ধ স্থাপন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনে স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হবে না। কলিযুগী কালচার বিদায় দিয়ে সত্যযুগী কালচার আয়ত্ব করতে হলে পরমাত্মার সাথে আত্মার সম্বন্ধ আবশ্যিক শর্ত।

কর্ম, সংস্কার সম্বন্ধ ও পুনর্জন্ম

- ব্রহ্মাকুমারী এঞ্জেলা

মানুষকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হয়। আত্মা অমর। একে বিদেহী আত্মা বলা হয়। রক্ত-মাংসের শরীর ধ্বংস হয়ে যায় মৃত্যুর পর। এই সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে যায় মানুষের জ্ঞান, গুণ, কর্ম ও সংস্কার। সূক্ষ্মদেহ কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার দেহ ধারণ করে। এই কর্মফলের দাতা কিন্তু ভগবান নন। তিনি নিষ্কাম ও সাক্ষীদ্রষ্টা। আমার কর্মরূপী ব্যালেন্স থেকেই তিনি আমাকে ফল দেন। দুঃখ পেলে আমরা বিধাতাকে মিথ্যে দোষ দিই। যদি শ্রেষ্ঠ কর্ম জমা থাকে তাহলেই সুন্দর শরীর দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। একে বলা প্রারব্ধ কর্ম। সকল মানুষের শরীর ও প্রকৃতি কখনও এক হয় না। এমনকি এক পরিবারের মধ্যেও চার ভাই চার রকম প্রকৃতির হন। এর কারণও তার পূর্বজন্মের সংস্কার। যেমন হাজার গাই থাকলেও বাছুর তার মাকে খুঁজে নেয়, তেমনি পূর্বজন্মের কর্ম পরজন্মে তার কর্তাকে খুঁজে নেয়। এই জীবনরূপী ড্রামা স্পষ্ট ও পূর্বনির্দিষ্ট।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের বিচার আছে যা আমরা মন দ্বারা উৎপন্ন করি ও বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করি। যে বিষয় আমরা ধারণ করি ও নিজের বানিয়ে নিই তাই সংস্কার। শরীর ও মনের দ্বারা আমরা যে কর্ম করি তাই সংস্কার রূপে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। সংস্কার কখনোই নষ্ট হয় না। বিদেহী আত্মা একবার মনুষ্য শরীর ধারণ করলে সে কখনো ইতর প্রাণীর শরীর গ্রহণ করে না কিন্তু মনুষ্য শরীর পেয়েও সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে।

আমি যদি কাউকে দুঃখ দিই, আমি যদি কারোর ক্ষতি করি সে ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে-এটাই নিয়ম। একেই বলে কর্মবাদ বা কর্মভোগ। এই কর্মফল আত্মা দ্বাপর ও কলিযুগে অনুভব করে। ও প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক্ ঃ এক অতি স্থূলকায়া সুন্দরী ছিলেন। হাঁটা, বসা, স্নান করা - সবই তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। এজন্য মাঝে মাঝে তাকে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। স্থূলত্ব কমানোর চেষ্টা নানাভাবে করা হল কিন্তু কোনো ফল হল না। সম্মোহনকারী ডাক্তার সম্মোহন করে তাকে পূর্বজন্মে নিয়ে গিয়ে দেখলেন তিনি মোটা লোকদের উপহাস করতেন। তিনি পূর্বজন্মে ছিলেন রোমের এক প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়। মোটা লোকেদের দেখে মজা করাই ছিল তার কাজ। এতে অন্যদের মনে দুঃখ হত। তাই এজন্মে তার এরকম অবস্থা হয়েছে। বৃক্ষের বীজে যেমন থাকে বৃক্ষের প্রাণ তেমনি জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে প্রাণ, মন ও চৈতন্য শক্তি। অতীত জীবনের সংস্কার সূক্ষ্মবীজের আকারে মানুষের অন্তকরণে সঞ্চিত থাকে। অতীত জীবনের সংস্কার যেমন বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি বর্তমান জীবনের সংস্কার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। জীবিতকালে আমাদের মনে যে ইচ্ছে প্রবল থাকে মৃত্যুর পর তা আরও শক্তিশালী হয় ও আত্মার প্রকৃতি ও চরিত্রকে সেভাবে গঠন করে। যেমন এ জন্মে যদি আমার একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হবার কামনা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যদি আমার বাসনা পূরণ না হয় তবে সেই বাসনা পূরণ হবার জন্য পরবর্তী জন্মে এমনই পিতামাতাকে ক্ষেত্ররূপে ও পরিবেশ রূপে পেয়ে যাবো যেখানে আমার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হবে। পবিত্র জীবাত্মা পবিত্র ক্ষেত্রই পায়। যে মানুষ খুনী তাকে এজগতেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই তাকে আবার জন্ম নিতেই হয়। কোন মানুষ যে খারাপ বা ভালো হয় এর কারণও তার পূর্বজন্মের কর্ম ও সংস্কার। একটি বাচ্চার

ছোট থেকেই ভয় রোগ ছিল। একলা থাকতে পারতো না, একা কোথাও যেতে পারতো না। সম্মোহন-এর সাহায্য নিয়ে জানা যায় পূর্বজন্মে সে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু সে ভীতি তার এজন্মেও থেকে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় কেউ জলকে ভয় পায়, পুকুর বা নদীতে স্নান করতে চায় না, হয়তো সে জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। পূর্বজন্মের অনুভব সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এজন্যই কেউ সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন পান আবার কেউ সারাজীবন দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়ান, কেউ সৎ প্রকৃতির, আবার কেউ অসৎ প্রকৃতির, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। যেমন, অঙ্গহীন দেহ পূর্বজন্মেরই কোন কর্মের ফল। এ সত্য বুঝবেন কেবল কোন আত্মজ্ঞানী।

অনেককে দেখা যায় জিভের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যা খুশি তাই খায়। এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ওপর যদি সে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারে তাহলে পরের জন্মেও তাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকতে হবে। যে ব্যক্তি বিষয়ের পিছনে দৌড়োয় তার বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা বাড়ে। পূর্বজন্মে কেউ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে বা অসৎ পথে অর্জন করলে এ জন্মে তার দরিদ্রতা আসবেই। সম্মোহক কেসি দেখিয়েছিলেন, পূর্বজন্মের একজন সেনাধিকারী ছিলেন তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তি তিনি অসৎ পথে অর্জন করেছিলেন। এজন্য অনেককে ঠোঁকা দিয়েছিলেন। পূর্বজন্মের ঠোঁকাবাজির জন্য এজন্মে তাকে দরিদ্রতা সহ্য করতে হয়েছিল। কর্মের দ্বারাই মানুষের সংস্কার তৈরি হয় যা পরজন্মেও থেকে যায়। অতীত জীবনের সংস্কারই বর্তমান চরিত্র গঠনের উপাদান এবং একারণেই প্রতিভাবান ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়। এ জীবনে আমরা কর্ম যেখানে শেষ করি পরবর্তী জীবনে সেখান থেকেই শুরু করি। এজন্য ৫-৬ বৎসর বয়সেই অনেকের প্রতিভার সূচনা দেখা যায়। অনেক শিশুকে দেখা যায় তিন কি চার বছর বয়সেই ভালো আঁকে, খুব ভালো গান গায়, অনেক কঠিন অঙ্ক করে ফেলে। এটা প্রমাণ দেয় তার এই প্রতিভা পূর্বজন্ম প্রসূত। এক বালক খুব দুষ্টু ছিল। মায়ের কথা শুনতোই না। পিতা সমাজসেবক ছিলেন। মায়েরও সেবার মনোভাব ছিল।, কিন্তু তাঁর ছেলের বিজ্ঞানে আগ্রহ ছিল। তাঁর পূর্বজন্মের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে সে মারণ অস্ত্র তৈরি করত। তারপর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়। এজন্মেও দেখা যায় তার ঐদিকেই আগ্রহ বেশি। দয়া-মায়া-ভালোবাসা থেকে সে অনেক দূরে।

পূর্বজন্মে কেউ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে বা অসৎ পথে অর্জন করলে এ জন্মে তার দরিদ্রতা আসবেই

নিঃস্বার্থ সেবা সুন্দর শরীর দান করে। আমেরিকার এক সুন্দরী যুবতী ছিলেন। তিনি এতই সুন্দরী ছিলেন যে তাঁর ছবি বিজ্ঞাপনের জন্য কস্‌মেটিক কোম্পানি চাইত। বিজ্ঞাপনের পরে সেই বস্তুর চাহিদাও বাড়ত। এই সৌন্দর্যের কারণ হিসাবে সম্মোহনের মাধ্যমে দেখা গিয়েছিল পূর্বজন্মে তিনি ইংল্যান্ডে অনাথ বাচ্চাদের সেবা করতেন। সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন - "আমি যেন সেবার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারি"। এভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের জীবন অনাথ বাচ্চাদের সেবার কাজে উৎসর্গ করার জন্য শরীর ও মন অপূর্ব সৌন্দর্যযুক্ত হয়ে যায়। অনাথ বাচ্চাদের সেবারূপী সুন্দর কাজ পূর্বজন্মে করার জন্য এ জন্মে সুন্দর শরীর ও জীবন পেয়েছেন। বর্তমান জীবনে আমরা স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধু হিসাবে যে একে অপরকে পাই এর কারণ, অতীত জন্মেও তাদের সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্ক ছিল। কারণ শরীরের মৃত্যু হলেও ভালোবাসা নষ্ট হয় না। মাতা, পিতা ও সন্তানের মধ্যে পূর্বজন্মের গভীর সম্বন্ধ

থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় বংশঘটিত গুণের চেয়ে জন্ম-জন্মান্তরের স্বভাব বেশি প্রকট হয়। আমার বর্তমান জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ এর পিছনেও আছে আমার কর্ম। পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী আমার অদৃষ্ট তৈরি হয়। এজন্যই বলা হয় - Man is the maker of his own fortune অথবা As you sow so you reap.

উপসংহারে এসে বলি, ঈশ্বরের ওপর সমর্পণ করে যখন আমরা কোন কাজ করি তা কর্মযোগ বা কর্মফল। সকল ভাগ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্বাস্থ্য ভাগ্য। সুদৃঢ় শরীর প্রাপ্ত করতে হলে যতটা সম্ভব শরীর দ্বারা নিঃস্বার্থরূপে সমাজের সেবা করতে হবে এবং এর ফল চাওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। শ্রীরাম, শ্রীসীতা, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনারায়ণ সকলেরই সুন্দর শরীর ছিল। পূর্বজন্মের কর্মের ফলস্বরূপ তাঁরা এই ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলেন। বুদ্ধের শরীর রাজকুমার হয়েও অঙ্গ সামুদ্রিক শাস্ত্র অনুযায়ী সন্ন্যাসীর শরীর ছিল। অঙ্গ সামুদ্রিক শাস্ত্রকাররা বলতেন, উনি মহাত্মা হবেন। তাই কর্ম ও ফল সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের পর আমাদের সকলেরই উচিত ভালো কর্ম করে, জ্ঞান অর্জন করে ভালো সংস্কার তৈরি করে নিজেদের জন্ম-জন্মান্তরের হিসাব ঠিক রাখা।

স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ

(অব্যক্ত মুরলী ০২-০২-১২)

বাপদাদা প্রত্যেককে স্বরাজ্য অধিকারীর আসনে বসিয়েছেন। প্রত্যেকে স্বরাজ্য অধিকারীর সাথে স্বমানধারীও। আমি স্বমানধারী আত্মা, এই স্মৃতিতে বসো এবং স্বমানের তালিকা সামনে নিয়ে এসো। সারাদিন স্বমানের মালা পড়লে এবং অনুভব করলে সর্বশক্তি তোমার আদেশে চলবে।

যেমন তোমরা ট্রাফিক কন্ট্রোল করো ঠিক তেমনি স্বমানের স্মৃতি আদিকাল হতে রিটার্ণ জার্নি পর্যন্ত করতে থাকো। এর জন্য মাঝে মাঝে সময় নির্বাচন করো এবং চলতে ফিরতে অভ্যাস করতে থাকো।

সবচেয়ে বড় অথরিটি হল অনুভব। অমৃতবেলায় প্রত্যেকে অনুভবের অথরিটি নিয়ে বসো, স্মৃতিতে বসছো ঠিকই কিন্তু স্মৃতিস্বরূপ অনুভাবী মূরত হয়ে অনুভবের অতলে ডুব দাও। এই অনুভবের অথরিটি অধিক থেকে অধিকতর কার্যকরী।

এসময়ে প্রতিটি সেন্টার নির্বিঘ্ন ও ব্যর্থ সংকল্প রহিত করো। সেন্টার নির্বিঘ্ন সাথিরাও নির্বিঘ্ন। বাপদাদার দুটো বিষয় চাই, এক সেবার বৃদ্ধি, দুই নির্বিঘ্ন সেবা।

যোগে অনুভব স্বরূপ হয়ে বসো, এ বিষয়ে আর একটু মনোযোগ প্রয়োজন। এমনভাবে লক্ষ্য রেখে বসো যাতে করে এর প্রভাব সকালের শক্তিশালী কর্মযোগে পড়ে। সেন্টারের বায়ুমণ্ডলে পড়ে, এইটুকু এডিশন চাই।

বিচারসাগর মন্থনে

নাগারা আর নজারে

- ব্রহ্মাকুমার লক্ষ্মীকান্ত, ইছাপুর

গত কয়েক দিন আগে (২৩.১০.৭৫) সালের অব্যক্ত মুরলী শুনছিলাম, মুরলী, সাধারণ অর্থে বাঁশী, কিন্তু এ সাধারণ বাঁশের বাঁশী নয়, পরমাত্মার দিব্য মহাবাক্য। যার মহিমা, গোপ-গোপীরা ভালভাবে জানে। যা একমাত্র সঙ্গমে, সাকার ব্রহ্মার মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যায়। মুরলীতে এমন দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল, যা আমার কর্ণকুহরে বারবার অনুরণিত হচ্ছিল। বর্ণনার ভঙ্গিমা এমনই মনোগ্রাহী, তার দৃশ্য চিত্তপটে ভেসে এল। শব্দটি, 'নাগারা আর নজারে'। যেন জাদু ছিল ওই শব্দতে।

'নাগারা' হচ্ছে ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র, রামায়ণে, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে ওই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়েছে। 'নজারে' হচ্ছে সুন্দর দৃশ্য। স্বর্গের অপূর্ব দৃশ্যের কথাই বলেছেন। 'শিববাবা' এরূপ দুটি শব্দের ব্যবহারের উদ্দেশ্য খুঁজতে গিয়ে লজ্জিত হলাম। কারণ আপন ঘরে যাওয়ার আগে ব্রাহ্মণ তপস্বী আত্মাদের পুরুষার্থ যে রূপ হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। অথচ বিনাশ দ্রুত এগিয়ে আসছে, প্রকৃতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। মানুষ প্রকৃতিকে তার নিজের স্বার্থে যথেচ্ছ অপব্যবহার করার ফলে, প্রকৃতিও রুষ্ট, তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কেউ আবার বিনাশের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ এভার রেডি ও সকল প্রকার পরিস্থিতির মোকাবিলায় যে শক্তির প্রয়োজন, তা হতে বিরত রয়েছে। বিশ্বকল্যাণকারী পিতা, তাই বাচ্চাদের মনোবল বাড়াতে তীব্র পুরুষার্থ করার লক্ষ্যে আর তপোবল, ও দিব্যশক্তিতে ইন্দ্রিয়জিৎ ও প্রকৃতিজিৎ হতে ইশারা দিলেন। কারণ, পরমার্থ শক্তিই 'এক বল, এক ভরসা'।

একবার ব্রহ্মার মনে, নবসৃষ্টি রচনার্থে সংকল্প উঠল, কিন্তু একা নয়, সাথে সাথে ব্রাহ্মণের মনেও সংকল্প এল, পুরনো দুনিয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন, সর্বজ্ঞ পিতা, এর পরিপ্রেক্ষিতে মুরলীতে জানালেন, - সকল ব্রাহ্মণের মনে দৃঢ় সাংগঠনিক শক্তির বিশেষ মনোবল প্রয়োজন। তখন পরিবর্তন আসবে। আর সমাপ্তি সমারোহের 'নাগারা' বাজবে। একদিকে সৃষ্টি, অপরদিকে বিনাশের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য। একদিকে মুক্তি, অপরদিকে জীবনমুক্তির গেট খুলে যাবে, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সকলের সহ্য হবে না। অতি বলবান, মহাবীর তপস্বীরাই দেখবে।

এবার তিনি বিনাশের দৃশ্য বর্ণনা দিচ্ছেন - কোথাও ভূমিকম্পের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে ভূমি উথাল-পাতাল হবে, কোথাও আনবিক বিস্ফোরণে জীবননাশ, কোথাও জলোচ্ছ্বাসে তিনভাগ জলরাশি, শুধু একভাগ স্থল, দ্বীপের মত দেখতে হবে। প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে, অনেক ধর্মের পরিসমাপ্তি, চারিদিকে শুধু হাহাকারের শব্দ, ওই পরিবেশে, মানব আত্মাগণ, শরীর ছেড়ে মুক্তিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। স্থল ভাগের অবিনাশী ভারতভূমিতে বিশ্বের প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের জন্মের শুভবার্তা মহান আত্মাদের কাছে শুধু পৌঁছাবে। আর শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিন্তে মাতাপিতার স্নেহে পালিত হবে।

এইভাবে পুরনো দুনিয়ার বিনাশের 'নাগারা' বাজবে, অন্যদিকে বিশ্বের মালিক, শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাতে, প্রকৃতি সানন্দে সহযোগ দেবে। ক্রমে, স্বর্গের দৃশ্য, নজারে হবে প্রত্যক্ষ। প্রতিকল্পের অন্তে পুনরাবৃত্তি হবে ওইভাবে।

ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা নয় বাস্তব

- ব্রহ্মাকুমার শিবু, কলকাতা

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ভগবানের অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে। ভগবানের জ্বলন্ত উপস্থিতি আছে তাই ব্রহ্মাকুমারীজ আছে যেদিন ভগবানের নতুন দুনিয়া নির্মাণের মহান কর্মের ইতি হবে সেদিন এই প্রতিষ্ঠানের আর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। এরকম ব্যতিক্রমী অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান বিশ্বের আর দ্বিতীয়টি নেই আর হবেও না। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হলে ভগবানের দেওয়া জ্ঞানের আধারেই করতে হবে কারণ 'রচনা' কখনো 'রচয়িতা'-র সামগ্রীক রূপ বর্ণনা করতে সক্ষম নয়। তিনিই একমাত্র রচয়িতা আর আমরা তাঁর রচনা। তাই এই আলোচনা মানে - গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গা পূজা করা। অর্থাৎ ভগবান প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া।

ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন ৭৭ বছর হয়ে গেল। পৃথিবীতে এসে তাঁর কী এমন জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন হয় যা দুনিয়াতে নেই? সোজাসাপটা উত্তর 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান'। তাহলে প্রশ্ন উঠবে দুনিয়াতে যে বহু ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্র আদি আছে তাতে কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই? হ্যাঁ, আছে; 'আটে মে নমক' অর্থাৎ আটা মেখে রুটি তৈরি করতে যে ছিটেফোঁটা নুন লাগে ততটুকুই আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক্ গীতায় বর্ণিত 'মন্মনাভব' মহামন্ত্র এবং বেদে 'ব্রহ্মা সো বিষ্ণু, বিষ্ণু সো ব্রহ্মা' এর ব্যাখ্যা এবং রহস্য বিদ্বান, পণ্ডিত, আচার্যের কাছে থাকে না বলে ভগবানকে সত্যযুগে নয়, ত্রেতাযুগে নয়, দ্বাপর যুগে নয় কলিযুগের অন্তিমে নিজ নিবাস 'পরম ধাম' থেকে বা ব্রহ্মমহাতত্ত্ব থেকে এই পৃথিবীতে কোন এক সাধারণ বৃদ্ধের (ব্রহ্মা) তনুতে প্রবেশ করে জ্ঞান দিতে হয়। তাঁর দেওয়া জ্ঞানে তিনটে বিষয় থাকে। ১) আমার পরিচয়, ২) ঈশ্বরের পরিচয়, ৩) সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-সঙ্গম এই পাঁচটি যুগ কীভাবে পাঁচহাজার বছরের মধ্যে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান। অর্থাৎ কালচক্রের জ্ঞান। জ্ঞানের সাগর ভগবানকে এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান কেন দিতে হয়? 'মনুষ্যাত্মা' এবং 'প্রকৃতি'-কে পবিত্র করতে ।

মানব সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা আছে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে; যেমন- ' ঈশ্বর টিশ্বর বলে কিছু নেই।', 'ধর্ম কর্ম করা মানে ফালতু সময় নষ্ট।', 'হয়তো কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে।', 'ভগবানের নাম ও রূপ কিছু হয় না।', 'যেদিক দেখি সবই ভগবানের রূপ।', 'অনু-পরমানু, ইট, কাঠ, পাথরে তাঁরই অবস্থান।', 'ধর্মস্থাপক ও ধর্মপ্রচারক সব ভগবান।', 'আমার পিতামাতাই ভগবান।', 'দেবদেবীগণ ভগবান।', 'নরের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।', 'ব্রহ্মাই ভগবান।' 'জীবের মধ্যেই শিবের অবস্থান।', 'উপরওয়ালা উপরে থাকেন।' 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান', 'ভগবান সর্বব্যাপী' আরো যে কত ধ্যানধারণা আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এর মধ্যে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, জানা নেই কারোর। সত্য 'শিব' এসে সত্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি জানান, ভগবান সর্বব্যাপী হলে পৃথিবীতে সর্বত্র সুখশান্তি থাকত। পৃথিবীর অন্যতম সেরা কল্পনা হল 'ভগবান সর্বব্যাপী'। এবার প্রশ্ন ঃ এতসব জেনে মানুষ কি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে নাকি ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে? এর প্রেক্ষিতে ভগবান যা শুনিয়েছেন- হে মনুষ্য, তুমি নিজেকে ভুলেছো, আমাকে ভুলেছো আর নাস্তিকে পরিণত হয়ে সুখশান্তি হারিয়েছ এবং বহুদূরে সরে গেছ। বিশ্বসমাজের একটা নিয়ম হল যার উপস্থিতি নেই তাকে নিয়ে চর্চা হয় না। বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক - সমাজে যার

প্রতি শ্রদ্ধা নেই আদর নেই, আছে ঘৃণা। তাকে কী করে? তার কুশপুতুল তৈরি করে তাকে অপমান করে এমনকী পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি বেঁচে না থাকে তাকে নিয়ে কেউ স্লোগান দেয় না বা কুশপুতুল দাহও করে না।

ভগবানকে নিয়ে কি এই রকম হয়? ভগবানকে নিয়ে বিগত ২৫০০ বছর যাবৎ চর্চা হচ্ছে আগামী দিনে আরো ঘোরতর হবে। বর্তমান সময়টা হল আধ্যাত্মিকতার মরশুম। যদিও বর্তমান পৃথিবীতে ভৌতিক জ্ঞানের রমরমা আকাশছোঁয়া। সৃষ্টির নিয়মানুসারে বর্তমান সময়টা দারুণ বিভ্রান্তিরও সময়। কারণ বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, ধর্মে এবং কর্মে এই চার বিষয় চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে মানুষ। এই চার বিষয়ে যে 'প্রাণভোমরা' সে পালিয়ে গেছে, তাহল 'পবিত্রতা'। ঈশ্বরই পবিত্রতা দান করেন। ভৌতিক জ্ঞানে বলিয়ান মহাজ্ঞানী থেকে স্বল্প জ্ঞানী ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ এলেই প্রশ্ন রাখেন- ঈশ্বরকে দেখান? একই প্রশ্ন ধর্ম কর্ম ও রাজনীতির সিংহভাগ মানুষই করেন। তাঁদের ভাবখানা এমন, বিজ্ঞান এমন এক বিষয় যা দিয়ে সব চাক্ষুষ করা যাবে। অর্থাৎ চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের গোচরে এলেই বিশ্বাস হবে নচেৎ নয়। সাধারণ মরীচিকার কবলে পড়লে চোখের সব জারিজুরি খতম হয়ে যায়, সেখানে সর্বশক্তিমান জ্ঞানের সাগর পবিত্রতার সাগর ভগবানকে চাক্ষুষ করবেন! মানুষই খেয়াল রাখেনা বিজ্ঞানই শেখায় এক-একটা ইন্দ্রিয় এক-একটা কাজের জন্য। ধরা যাক্ কেউ একটি সুমধুর গান উপভোগ করবে। সেকি চোখ দিয়ে করবে না কান দিয়ে? কেউ একটা ফুলের গন্ধ নেবে, সে কি চোখ দিয়ে নেবে না নাক দিয়ে? কেউ একটু ঘি দেখতে চায়, সেকি চোখ দিয়ে চাখবে না জিভ দিয়ে স্বাদ নেবে? ঠাণ্ডা বা গরম কি চোখ দিয়ে অনুভব করবে না ত্বক দিয়ে করবে ? এভাবে আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়গুলোরও আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে। আমাদের অনুভূতি শুধুমাত্র চোখ নির্ভর নয়। ভগবান বলেছেন, আরো দুটো তোমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে । যে ইন্দ্রিয় দুটোর জন্য পৃথিবীব্যাপী দূষণ হয়েছে। সেই ইন্দ্রিয় দুটো 'মন ও বুদ্ধি'। পৃথিবীর বর্তমান যে পাপাচার, ভ্রষ্টাচার, ব্যাভিচার, দুঃখ-অশান্তি তার মূলে ওই মন ও বুদ্ধির দূষণ। মন ও বুদ্ধি শরীরে কোথায় থাকে তা জানা নেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের। ভগবানকে এসে জানাতে হয় মন ও বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মবিন্দু স্বরূপ যা আত্মারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আত্মাও অতি সূক্ষ্ম চক্ষুগোচরহীন, অবিনাশী। থাকে এই শরীরের দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানে।

> *মন ও বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মবিন্দু স্বরূপ যা আত্মারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ*

সর্বশক্তিমান, জ্ঞানের সাগর ও পবিত্রতার সাগর নিরাকার বিন্দুস্বরূপ 'শিব' ভগবানকে দেখতে হলে মন ও বুদ্ধিতে ন্যূনতম শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা ধারণ করে প্রথমে 'আত্মদর্শন' করতে হবে তবেই সে মানস চক্ষে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, তার আগে নয়। তবে শর্ত হল প্রথমে 'নিশ্চয়' চাই ব্রহ্মাকুমারীজের জ্ঞান ঈশ্বর প্রদত্ত। তাহলেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব নচেৎ নয়। এর মধ্যে কোন অন্ধশ্রদ্ধা বা ভাবাবেগ নেই। কারণ যেখানে যাঁর অবস্থান। যেমন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির বিচার পেতে হলে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। বর্তমানে ভগবান ব্রহ্মাকুমারীজের হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান সর্বব্যাপী নয়, তাঁর 'প্রভাব' সর্বব্যাপী। ব্রহ্মাকুমারীজের অনুভাবী শিক্ষার্থী সত্য ও শুদ্ধ গরিমা নিয়ে বলবেন, আমি শুধু তাঁকে দেখিনা, তিনি আমার সর্বক্ষণের সাথি। আধ্যাত্মিক শিক্ষাই হল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জানার একমাত্র পথ। ইহা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনাই মনে হবে।

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়

- ব্রহ্মাকুমারী শিখা, গোবরডাঙ্গা

২০০৩ সাল ২৫ ডিসেম্বর ঠিক বেলা ১১টায় পেলাম আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান। জানলাম কীভাবে পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন ঘটাতে পারে সাধারণ মানুষ। সাথে সাথে অতীন্দ্রিয় সুখ, শান্তি অনুভব করতে, পার্থিব জগতের সাংসারিক বন্ধন থেকে নিজেকে সদা মুক্ত, খুশিতে ভরপুর থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য কীভাবে সম্ভব।

আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল ঃ বড় চাকরী করব, ভালো সেতার বাজাব। কিন্তু ভাগ্যচক্রে কিছুই সম্ভব হয়নি। হলাম ১৯৮৩ সালে গোবরডাঙার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়েএকটু সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম। শান্তি ঠিক না থাকলেও কিছুটা সুখ ছিল। ২০০০ সাল থেকে অনেক ঘাত ও প্রতিঘাতের সম্মুখীন হলাম, জীবন কাটানোই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ রাস্তায় একদিন শিবুভাই-এর সাথে দেখা। ওকে চিনি বহুদিন ধরে, আমারই স্বামীর স্কুলের ছাত্র ছিল ও। বড় ছেলের যোগ-ব্যায়ামের শিক্ষক ছিল। খুবই প্রাণোচ্ছল ছেলে, ভদ্র, নম্র ও মৃদু হাস্যময় মুখাবয়ব। কিন্তু সেদিন শিবুভাইকে দেখে অন্যরকম লাগল। অনেকদিন দেখাও হয় না, তখন শিবুভাই থাকে বালিগঞ্জে। মনে হল শিবুভাই যেন জীবনের কোন চরম সত্যের সন্ধান পেয়েছে। ওর চোখের চাহনি ও কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হল জীবনের চরম খুশির সন্ধান ওর কাছে গেলে পাওয়া যাবে। তাই রবিবার গোবরডাঙার Blue-star Club-এ যোগব্যায়ামের ক্লাস করাতে আসত। ঠিক ১১টায় গেলাম, বললাম, ভাই তোমার স্যারকে একটু যোগব্যায়াম শেখাবে। ও বলল, "কাকিমা, শারীরিক ব্যায়াম শিখে সাময়িক সুরাহা হবে কিন্তু এখন আমাদের মানসিক খাবারের অভাব। তাই বসুন, ঈশ্বরের সাথে আপনি কীভাবে মিলিত হবেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান, গুণ ও শক্তি নেওয়া শিখি। দোদুল্যমান জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভয় ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন কাটানো থেকে মুক্ত হয়ে ঐশ্বরিক সুখ-শান্তি ও টেন্‌শন্ বিহীন জীবন কাটাতে পারবেন। সাথে সাথে দৈহিক স্বাস্থ্যের ও উন্নতি হবে।" সেদিন রাতেই স্বপ্নে শিববাবার রূপ ও জ্যোতির এক প্রভা সারা বিশ্বজুড়ে দেখলাম। আমার মনে এক উচাটনের সৃষ্টি হল। এ আমি কী দেখলাম! লাল-সোনালি সারা আকাশ জুড়ে আলোর ঝলক। বিবেকানন্দের লেখা রাজযোগ পড়েছি কিন্তু শিবুভাই যে রাজযোগের কথা বলল ও স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখলাম এ আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাড়ি থেকে এলগিন সেন্টার ৫ ঘণ্টার পথ। কিন্তু পাগল হয়েছিলাম সৃষ্টি রহস্য ভালোভাবে জানার জন্য। দূরত্ব আমাকে দমাতে পারেনি। আজ বুঝি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' কথার অর্থ। আমার জীবনে আর কোন অতৃপ্তি নেই। সেই চরম সত্য ও চরম শান্তি পাবার জন্য ছোট থেকে প্রচেষ্টা করেছি, তা সম্পূর্ণ রূপেই পেয়েছি। ঈশ্বর যেন জীবনের সুখ ও শান্তির 'রিমোট' আমাদেরই হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন শিখছি যখন যেভাবে দরকার নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ও বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেও শান্তি অনুভব করার, পরিস্থিতিকে 'পর'স্থিতি করার জন্য মনের গঠন তৈরি করার শক্তি।

সেবায় নিমিত্ত হওয়ার সৌভাগ্য ও শিববাবাকে পেয়ে হাতে চাঁদ পাওয়া বোধহয় কম হবে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাপ্তি অনুভব হয়েছে তাহল খুশি তৃপ্তি, সন্তুষ্টতা। আমার

এই প্রাপ্তি আমাকেই প্রণিত করেছে যাতে অন্যেরাও এইরূপ প্রাপ্তি পেয়ে ভরপুর হয়। আমার এই লক্ষ্য ভাগ্যবিধাতা বাবা আমাকে টাচ করাতে সংকল্প করলাম লৌকিক বাড়িতেই সেবাস্থান করব। ড্রামা অনুসারে ক্লাসও শুরু হয়ে গেল। দু-চার জন ভাইবোন দিয়ে সেবা শুরু হল ২০০৪ সালে। এখন তার বিস্তার বেশ কিছুটা হয়েছে। এলগিন থেকে বরিষ্ঠ রাজযোগিনী দিদি কাননজি নিজে এসে এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমি সেবা করে নিজের ভাগ্য তৈরির সুযোগ পেয়ে ধন্য হচ্ছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি পরমপ্রিয় বাবাকে এবং নিমিত্ত কানন দিদিকে। প্রতিবছর নিয়মিত আমাদের গীতা-পাঠশালা থেকে এলগিনের তত্ত্বাবধানে মধুবনে বাপদাদার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ভাইবোনেরা মহান সুযোগ পান। এতে আমি মহা তৃপ্তি পাই। সদাই বাবাকে সাথে রাখি। বাবা আমার পরম বন্ধু, গুরু, শিক্ষক ও 'লাভলে বাবা'। জানাই পুরনো দুঃখ-কষ্টকে ধন্যবাদ। তাইতো পেয়েছি আমারই একান্ত বাবাকে। সদা মনে হয় বাবার শক্তি ও গুণে পর্বতের শিখরে উঠছি, হঠাৎ বাহ্যিক প্রতিঘাত (মায়া) এক ঝটকায় অনেক নীচে নামিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। তাই বাবার হাত শক্ত ভাবে ধরে রাখি, বলি বাবা কোন মায়া যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে এক চুলও নড়াতে না পারে।

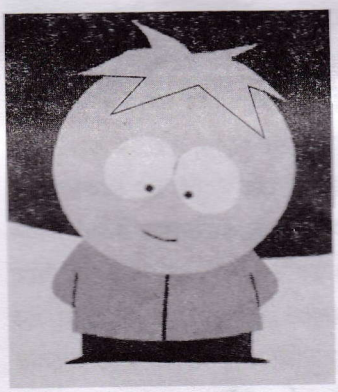

ভোলারাম

- ব্রহ্মাকুমার স্বপন
কলকাতা মিউজিয়াম

ভোলারাম- আচ্ছা গুরুদেব, 'আত্মোপলব্ধি' হলে কি হয়-য়-য়-য়-য় ?

গুরুদেব - কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

ভোলারাম- সে কি-ই-ই-ই ? 'বোবা' হয়ে যাবে-এ-এ-এ ?

গুরুদেব - তা কেন ? আসলে কথা না বলেও সে অনেক কথা বলে।

ভোলারাম- তার মানে, ওই যে কবি লিখেছেন/বলেছেন ঃ "অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি-ই-ই-ই ?"

গুরুদেব - ওটা তো প্রেমিক/প্রেমিকার কথা হয়ে গেল - তা নয়। আসলে তার কাছে কেউ আসলে তাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

ভোলারাম- ও মা-আ-আ-আ! তা তো ভয়ংকর! তারা বোবা হয়ে যায়-য়-য়-য় ?

গুরুদেব - না, তা কেন ? আসলে তাদের ব্যর্থ চিন্তাগুলো শেষ হয়ে যায়। তাদের মনে হয় - তাদের কথা বলা হয়ে গিয়েছে। তাদের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

ভোলারাম- ও-ও-ও-ও!!!

কটক ঃ
আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে দীপ প্রজ্জ্বলন করছেন বি. কে. জয়ন্তী, বি. কে. কমলেশ, ভ্রাতা ঋষিকেশ ত্রিপাঠী, নির্দেশক, নগরপালিকা, ভ্রাতা অরুণ পণ্ডা, বরিষ্ঠ পত্রকার বি. কে. রাধেশ্যাম এবং অন্যান্যরা।

নামচি ঃ
সোলোকোক চারধামের এ.ডি.এম. ভ্রাতা সাগর রাইকে ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. কানন ও বি. কে. শাকু।

দার্জিলিং ঃ
'সত্য ভাগবত কথা' অনুষ্ঠানে দীপ প্রজ্জ্বলন করছেন বিধায়ক ভ্রাতা ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ান সাথে বি. কে. মুনা ও অন্যান্যরা।

বালুরঘাট ঃ
৩৫০ জনের পুলিশবাহিনীকে রাজযোগ প্রশিক্ষণের পর বি. কে. স্বপনকে উপহার প্রদান করছেন পুলিশ আধিকারিক ভ্রাতা উদয়কুমার চ্যাটার্জী (আর.আই.পি.)।

Vol.2, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2013, Price ₹10/- only

মধুবন ঃ
SEW উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দীপ প্রজ্জ্বলন করছেন ভ্রাতা রামনারায়ণ মিনা, ডেপুটি স্পিকার, রাজস্থান বিধানসভা, সাথে বি. কে. মোহন সিংঘল, বি. কে. ভারতভূষণ, বি. কে. সরলা দিদিজি, বি. কে. নির্বের, বি. কে. ড. নির্মলা, বি. কে. স্বামীনাথন ও বি. কে. ভরত।

বরানগর ঃ
রামনবমী অনুষ্ঠানে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বি. কে. বোনেরা।

দুর্গাপুর ঃ
ত্রিদিবসীয় যোগশিবিরের পর সি.আই.এস.এফ.-এর ডি.আই.জি. হেমরাজ গুপ্তা এবং সেনাদের সাথে বি. কে. প্রমিলা ও বি. কে. জানকী।

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.